দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

মিডিয়া যতই বাজনা বাজাক
গুজরাটে জেতার ক্ষমতা
নেই রাহুলের
— পৃঃ ১২

পাহাড়ে অদৃশ্য
বিমল গুরুং ক্রমশই
অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে
— পৃঃ ১৪

৭০ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭।। ২ পৌষ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

মনোজ উপাধ্যায় খুনের নেপথ্যে কারা ?
জানতে চায় রাজ্যের মানুষ

হুগলী পুলিশ কমিশনারেট
পীযুষ পাণ্ডে সহ তিন পুলিশ
আধিকারিকের বদলি।
তদন্তের ভার সি আই ডি-র
হাতে দেওয়া হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত
খুনের দায়ে
বিভিন্ন রাজ্য
থেকে গ্রেফতার
৯ জন

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ২ পৌষ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১৮ ডিসেম্বর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

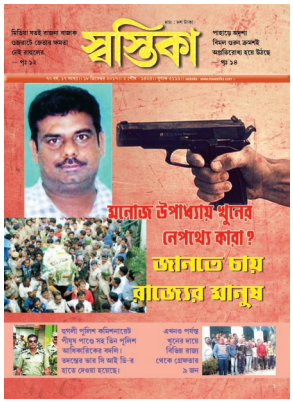

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

খোলা চিঠি : সাদা টাকায় পার্টি ফান্ড হয় নাকি!

▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১০

মানবাধিকার দিবসে সঙ্কল্প, চীনের জিনিস কিবন না

▯ ছন্দা ভড় ▯ ১১

মিডিয়া যতই বাজনা বাজাক, গুজরাটে জেতার ক্ষমতা রাহুলের নেই ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১২

পাহাড়ে অদৃশ্য বিমল গুরুং ক্রমশই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে

▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১৪

একশো টাকায় তিরিশ টাকা সুদ মাসি, না নিলে পস্তাবে

▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ১৬

মনোজ কিন্তু রোদ্দুর হতে পেরেছিল...

▯ শিলাদিত্য ▯ ১৯

মনোজ উপাধ্যায় এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক চরিত্র

▯ দেবাশিস আইয়ার ▯ ২১

অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান ভদ্রেশ্বরের মানুষ

▯ সোহম মিত্র ▯ ২৩

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : 'গোড় লাগি বরমদেওজি' ▯ ২৭

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির কথা ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৩১

মহাভারতের অপ্রধান নারী চরিত্র চিত্রাঙ্গদা

▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ৩২

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত ▯ সলিল গেঁউলি ▯ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** ▯ **অঙ্গনা : ৩৪** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৭** ▯ **অন্যরকম : ৩৮** ▯ **স্বজন বিয়োগ : ৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▯ **চিত্রকথা : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মুসলমান বাংলাদেশে হিন্দু সমাজ

বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্র। অর্থাৎ মুসলমানদের দেশ। সেখানে হিন্দুরা কেউ নন। তাদের ইচ্ছেমতো খুন করা যায়, অমুসলমান মেয়েদের যখন ইচ্ছা বলাৎকার করা যায়, ভিটেমাটি থেকে যে কোনোদিন উৎখাত করা যায়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী নেত্রী দুজনেই নিজেদের প্রয়োজন মতো হিন্দুদের দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করেন। আগামী সংখ্যায় স্বস্তিকার আলোচ্য বিষয়—বাংলাদেশে কেমন আছে হিন্দু সমাজ। উত্তর খুঁজবেন বিশিষ্ট লেখক মোহিত রায় এবং বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

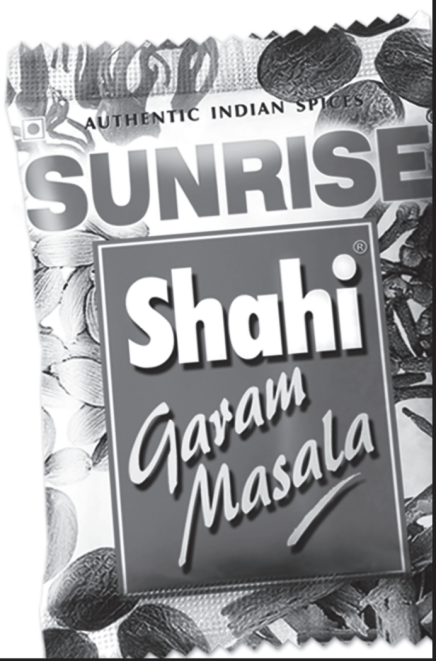

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

মৃত্যুর রাজনীতি

বুদ্ধির দেউলিয়াপনা বোধহয় ইহাকেই বলে। মালদার আফরাজুল রাজস্থানে ঠিকা শ্রমিকদের কাজ করিতে যাইয়া নৃশংসভাবে খুন হইয়াছে। খুনি একজন হিন্দু। আবার রাজ্যটি বিজেপি শাসিত। সুতরাং কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বামদলগুলি একটি ইস্যু পাইয়া রে রে করিয়া মাঠে নামিয়াছে। তাহারা সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মুণ্ডপাত করিতে লাগিয়া পড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বাম ও অতিবাম ছাত্রযুবরা ভারতবর্ষের মানচিত্রের ওপর আগুন জ্বালাইয়া সঙ্ঘের সদর দপ্তরে হামলা করিতে আসিতেছিল। বুদ্ধির অগম্য, ইহার মধ্যে তাহারা বিজেপি-আর এস এস-কে নিশানা করিল কেন?

যেকোনো মৃত্যুই দুঃখের। কিন্তু সেই মৃত্যুকে লইয়া রাজনীতি শুরু করা উচিত কি? কংগ্রেস, তৃণমূল ও বামদলগুলি তাহাই করিতেছে। কেননা ভোট বড় বালাই। বিজেপি ও আর এস এসের মুণ্ডপাত করিতে পারিলে ভোটের ঝুলি পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা তাহারা খুঁজিয়া পায়। বলা হইতেছে এই খুনের পশ্চাতে নাকি লাভ জেহাদের তত্ত্ব রহিয়াছে। বস্তুত এখনও পর্যন্ত রাজস্থান পুলিশ এইরকম কোনো তত্ত্ব পায় নাই। তথাপি উক্ত রাজনৈতিক দলগুলি এবং কতিপয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবী হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখিতে ও লিখিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ আবার দুই রকম ভারতের তত্ত্ব খাড়া করিয়াছেন। তাঁহাদের ভারতে ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে একজন সংখ্যালঘু খুন হইলে সরব প্রতিবাদ আর বহু হিন্দু একইভাবে খুন হইলে মৌনব্রত অবলম্বন। ২০০৮ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার লক্ষ্মণপুরে বিহারের শ্রমিক শৈলেন্দ্র প্রসাদকে সালিশি সভায় মাথা কাটিয়া লইয়া হত্যা করা হয়। তাঁহার অপরাধ মুনিরা বিবি নামক এক মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। খুনি মুনিরা বিবির বাবা-সহ প্রতিবেশীরা। ২০১২ সালে বনগাঁর দীপঙ্কর রায়কে গুলি করিয়া হত্যা করা হয় মুসলমান কন্যা সেলিমাকে বিবাহ করিবার অপরাধে। ২০১৫ সালে বাদুড়িয়ার নিতাই দাসকে মুসলমান কন্যা বিবাহ করিবার অপরাধে চোখ উপড়াইয়া লইয়া নৃশংস ভাবে গলা কাটিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাহিরেও এইরূপ নৃশংসভাবে খুন করা হয় ডজনখানেক হিন্দু যুবককে। অতি সম্প্রতি বিহারের মুকেশ কুমার ও নুরজাহান খাতুনকে নৃশংস ভাবে খুন করিয়াছে নুরজাহানের পরিবারের লোকেরা। তখন কিন্তু সেকুলার ধ্বজাধারী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের টিকিটির নাগাল পাওয়া যায় নাই। তখন কলকাতার রাজপথে মোমবাতির মিছিল দেখা যায় নাই। তখন কেশব ভবনে হামলা করিতে কেহ আসে নাই। সেদিন কোনো হিন্দু পরিবার টাকা পায় নাই। চাকুরিও পায় নাই। তাহাদের বাড়িতে সমবেদনা জানাইবার মতো নেতা-নেত্রীর দেখা পাওয়া যায় নাই। আফরাজুল সংখ্যালঘু হইবার কারণে আদিখ্যেতার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রীতি নষ্ট হইবার অজুহাতে যাঁহারা ধুলাগড়, বাদুড়িয়ার ঘটনা কোনো চ্যানেলে দেখান নাই, তাঁহারাই আফরাজুল খুনের ভিডিয়ো ক্লিপিংস দেখাইতে কার্পণ্য করেন নাই। ইহাকে বুদ্ধির দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কী বলা যাইবে?

আফরাজুল খুনের ঘটনায় রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া অত্যন্ত আন্তরিক। তিনি দোষীদের কঠোর শাস্তি চাহিয়াছেন, তৎসঙ্গে রাজস্থানের ডিজি জানাইয়াছেন যে, তদন্ত আইনানুগ পথেই চলিতেছে। বিশাল এই দেশে এইরকম কিছু অপ্রিয় ঘটনা ঘটে, তাহাতে শান্তি ও সৌহার্দ্য বিঘ্নিত হয়। এরকম দুঃখজনক ঘটনা যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস ও বামদলগুলি মৃত্যুকে লইয়া রাজনীতি শুরু করিয়াছে তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

সুভাষিতম্

যো ন সঞ্চরতে দেশান্ যো ন সেবতে পণ্ডিতান্।

তস্য সঙ্কুচিতা বুদ্ধির্ঘৃতাবিন্দুরিবাম্ভসি।।

যিনি দেশ পরিভ্রমণ করেন না, যিনি পণ্ডিতগণের সান্নিধ্য লাভ করেন না, তিনি জলে ঘৃতবিন্দুর মতো সঙ্কুচিত থাকেন।

রোহিঙ্গাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে লস্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রোহিঙ্গাদের মধ্যে এবার সরাসরি প্রবেশ করতে শুরু করেছে লস্কর-ই-তৈবার জঙ্গিরা। ফালহা-ই-ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশন-এর নামে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে পৌঁছে গিয়েছে লস্করের জঙ্গিরা। খাতায় কলমে

ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশন লস্করের দাতব্য প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ কেন্দ্রিক গোয়েন্দা সংস্থাকে উদ্ধৃত করে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে ইনসানিয়ান ফাউন্ডেশন রাখাইনের রোহিঙ্গাদের মধ্যে কম্বল ও কোটি কোটি টাকার অর্থ বিতরণ করার পাশাপাশি বাংলাদেশের কক্সবাজারের উদ্বাস্তু শিবিরেও স্থানীয় ইসলামি গোষ্ঠীর সহায়তায় ফাউন্ডেশন তাদের কাজকর্ম চালাচ্ছে। ফাউন্ডেশনের বৈদেশিক কর্মসূচির প্রধান সৈয়দ মেহমুদ এক অনলাইন বিবৃতিতে রাখাইনে এক 'অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি'তে তাদের 'ত্রাণকাজ'-এর কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রে দাবি করা হয়েছে যে ত্রাণকাজের সঙ্গে সঙ্গে উস্কানিমূলক লিফলেটও বিলি করা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের মধ্যে। নিরক্ষর রোহিঙ্গাদের জন্য চলছে মৌখিক প্রচারও। ফাউন্ডেশনের তরফে এক বিবৃতিতে এও জানানো হয়েছে মায়ানমারে যেখানে মুসলমানরা 'অবদমিত' রয়েছে সেখানেই তাদের কাজকর্ম প্রসারিত হবে। স্বাভাবিক ভাবে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সন্ত্রাস এবার ভিন্ন মাত্রা পাবে। তার কারণ আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি যা হারাকা আল ইয়াকিন নামে পরিচিত অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ও প্রশিক্ষিত জঙ্গি গোষ্ঠীর মদত পেলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি বিঘ্নিত হতে বাধ্য। যদিও রোহিঙ্গাদের সঙ্গে লস্করের সম্পর্ক অন্তত পাঁচ বছরের পুরানো।

২০১২ সালে লস্কর নেতা হাফিজ মহম্মদ সইদ রোহিঙ্গা জঙ্গি আব্দুল কুদোস বর্মির সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুসলমান দুনিয়া গড়ার লক্ষ্যে ডাক দিয়েছিল। ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশন কিছুদিন আগে ইন্দোনেশিয়ায় হাজার জন রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু পিছু একটি মাদ্রাসা ও প্রতিটি পরিবারের জন্য বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছিল। বর্তমানে লস্কর যেভাবে রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে এর পেছনে পাক-হাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না গোয়েন্দারা। বাংলাদেশ গত অক্টোবরে গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে স্থানীয় রোহিঙ্গাদের ওপর দাতব্য কাজ চালানো দু'টি ইসলামি গোষ্ঠীর কর্মসূচি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই দু'টি গোষ্ঠী হলো মুসলমান এইড ওইসলামিক রিলিফ।

এই দু'টি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই জঙ্গিযোগের অভিযোগ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের কাজকর্ম আটকানো যায়নি। গোয়েন্দারা আশঙ্কা করছেন ইনসানিয়াত ফাউন্ডেশনের আড়ালে এরা তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। মায়ানমার সেনাবাহিনীর অনেকদিনের অভিযোগ যে গত আগস্ট রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি যে পুলিশ ও আর্মি আউটপোস্টে হামলা চালিয়েছিল তার জন্য তারা পাকিস্তান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছিল।

স্যালভেশন আর্মির পাকিস্তান-জাত নেতা মহম্মদ আতাউল্লাহ, সৌদি আরবে যার উত্থান, গত কয়েকমাসে মায়ানমারে একের পর এক হামলার ঘটনায় তার নাম জড়িয়েছে। সব মিলিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উদ্বাস্তু, দেশছাড়া ইত্যাদি 'সেন্টিমেন্ট' মিশিয়ে কোনো কোনো মহল যেভাবে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করছে, বাস্তব পরিস্থিতি ঠিক তার উলটো বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

রোহিঙ্গাদের সঙ্গে জঙ্গি যোগ বহু পুরানো। এই পুরানো সম্পর্ককেই নতুন ভাবে জোড়া দিতে উদ্যোগী হয়েছে জঙ্গিরা। রোহিঙ্গাদের আগে যে জেহাদি সংগঠনটি ছিল তার নাম রোহিঙ্গা সলিভারিটি অর্গানাইজেশন। এর প্রথম সেনাপ্রধান হাফিজ সালাউল ইসলাম বাংলাদেশের কক্সবাজারকে কেন্দ্র করে ইমাম মুসলিম ইসলামিক সেন্টার নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালায়। মুসলিম যাজকবৃত্তির আড়ালে জঙ্গি কাজকর্মে মদত দেওয়াই এদের লক্ষ্য। একইভাবে সৌদি আরব ও পাকিস্তানে আব্দুল রহমান নামে এক রোহিঙ্গা মুসলমান সেখানকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে জঙ্গি কাজে পরিচালিত করছে বলে গোয়েন্দা-সূত্রে খবর। ফলে রোহিঙ্গা কাণ্ডে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আবার অশান্তির কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে।

ডোকলামে আবার চীনের সৈন্য শিবির, ভারত উদ্বিগ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত আগস্টে ভারতের কূটনীতির কাছে নিঃশব্দে পরাজয় স্বীকার করার পরেও যে চীনের আগ্রাসী মানসিকতায় তেমন কোনও বদল হয়নি সম্প্রতি তার প্রমাণ মিলেছে। ভারত- ভুটান-তিব্বতের ত্রিদেশীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চল ডোকলামে চীন ১৬০০-১৮০০ সৈন্যের স্থায়ী শিবির স্থাপন করেছে। সেই সঙ্গে তৈরি করেছে দুটি হেলিপ্যাড। খবর পাওয়া গেছে ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট মেরামতির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে চীন। ডোকলামের মারাত্মক ঠাণ্ডায় সৈন্যদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় তার জন্য বসানো হচ্ছে দোকানপাটও। বস্তুত প্রতিবারই শীতকালে তিন দেশের সেনাবাহিনী যে-যার বেসক্যাম্পে ফিরে যায়। শীত কমার পর আবার শুরু হয় সীমান্তে টহল। এই প্রথম চীনের জন্য তিন দেশের বোঝাপড়ায় বড়ো রকমের ফাটল ধরল।

ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর একটি সূত্র জানিয়েছে, যেহেতু ভারত চীনকে ডোকলামের দক্ষিণে রাস্তা সম্প্রসারণ করতে না দিয়ে ইতিমধ্যেই তার সামরিক কৌশলগত লক্ষ্য পূরণে সফল হয়েছে, চীন তাই স্থায়ী সেনা শিবির বানিয়ে ওই অঞ্চলের দখল নিতে চায়। আগে প্রতি বছর পিপলস্ লিবারেশন আর্মি চীন ও ভুটানের বিতর্কিত সীমান্তে এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বরে শিবির স্থাপন করত। উদ্দেশ্য, ওই অঞ্চলে চীনা মালিকানার দাবিটিকে প্রতিষ্ঠা করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসে ভুটানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে ভারতীয় সেনা ৭৩ দিন ধরে চীনাবাহিনীর চোখে চোখ রেখে ডোকলাম সীমান্তে অবস্থান করেছিল। বেজিং শীর্ষসম্মেলনের ঠিক আগে চীন সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। কারণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী যদি ডোকলাম ইস্যুকে সামনে রেখে শীর্ষ সম্মেলনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতেন তাহলে আন্তর্জাতিক মহলে চীনের একঘরে হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এখন আর চীনের সেরকম কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাই চীন আবার দাঁতনখ বের করে মাঠে নেমে পড়েছে।

ডোকলামে চীনের সৈন্য সমাবেশ অভূতপূর্ব হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। দু'দেশের মধ্যে পঞ্চশীল চুক্তি হবার পর থেকেই চীন নানাভাবে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভারসাম্য নষ্ট করার চেষ্টা করে আসছে। বস্তুত ডোকলাম থেকে সেনা-অপসারণের অব্যবহিত পর, গত সেপ্টেম্বরেই সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত দেশবাসীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, চীন আবার পেশি প্রদর্শন করে বিতর্কিত অঞ্চল জবরদখল করার চেষ্টা করবে। সেনা সূত্রের খবর, যেহেতু ভারতীয় সেনারা ভারত-তিব্বত-ভুটান ত্রিদেশীয় সীমান্তে অপেক্ষাকৃত সুবিধেজনক জায়গায় অবস্থান করছে তাই চীন চুম্বি উপত্যকায় নিজেদের দখল কায়েম করতে ডোকলামে সেনা ঘাঁটি তৈরি করার ব্যাপারে হন্যে হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত কোনওদিনই ডোকলামে চীনের সৈন্য সমাবেশে বাধা দেয়নি। শুধু গত বছর, জুনের মাঝামাঝি সময়ে ভারত চীনকে বাধা দেয়। কারণ চীন একটি রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল। এই রাস্তা তৈরি হলে ত্রিদেশীয় সীমান্তের স্থিতাবস্থা লঙ্ঘিত তো হতোই, সেই সঙ্গে প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে যেত ভারতের নিরাপত্তা। সেই কারণে ভারতীয় সেনা ডোকা লা পেরিয়ে ১৮ জুন ডোকলামে ঢুকে পড়ে এবং চীনাবাহিনীর সামনে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে থাকে ৭৩ দিন। যার ফলে শিলিগুড়ি করিডোরের নাগাল পাওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মীয়মাণ রাস্তার কাজ শেষ করা চীনের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত গত ৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সুখরঞ্জনবাবুর মৃত্যুতে

সাংবাদিকতা জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।' ওইদিন সন্ধ্যায় কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৮৫ বছর। প্রায় ৬০ বছর তিনি সংবাদজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাজ করেছেন লোকসেবক, জনসেবক। আনন্দবাজার এবং যুগান্তর পত্রিকায়। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় তার কাজ বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভীক সাংবাদিকতাকে সম্মান জানিয়ে গত বছর তাঁকে 'নারদ সম্মানে' ভূষিত করে বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র, কলকাতা। বাঙালির ঐতিহ্যশালী পোশাক ধুতিপাঞ্জাবি পরিহিত সুখরঞ্জনবাবুর সান্নিধ্য পেয়েছেন বহু প্রথিতযশা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছে কলকাতা প্রেসক্লাব। সুখরঞ্জনবাবু স্ত্রী, এক পুত্র এবং এক কন্যা রেখে গেছেন।

মোদী সরকারের কূটনৈতিক সাফল্য

ওয়াসেনর অ্যারেঞ্জমেন্টে ভারতের অন্তর্ভুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আন্তর্জাতিক রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ পরিষদের (গ্লোবাল এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেজিম) বিয়াল্লিশতম সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার একদিনের মধ্যে বিশ্বের অভিজাত ওয়াসেনর অ্যারেঞ্জমেন্টে ভারতের নাম নথিভুক্ত করা হলো। দিল্লির দৃঢ় এবং কুশলী কূটনীতিকে সম্মান জানিয়ে পরিষদের একচল্লিশটি সদস্যদেশ সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াসেনর অ্যারেঞ্জমেন্টের সদস্য হিসেবে ভারতকে মনোনীতি করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওয়াসেনর অ্যারেঞ্জমেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতামান পেরিয়েই ভারত এই সম্মান অর্জন করেছে। ভারতকে সমর্থন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই একচল্লিশটি সদস্য দেশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে।

বিদেশমন্ত্রক একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, 'সদস্যপদ পেতে ভারতের দাবি সমর্থন করার জন্য আমরা একচল্লিশটি সদস্য দেশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই ওয়াসেনর অ্যারেঞ্জমেন্টের প্লেনারি চেয়ারম্যান জঁ লুইকেও। এছাড়া, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ওয়াসেনর অ্যারেঞ্জমেন্ট সেক্রেটারিয়েটের প্রধান ফিলিপ গ্রিফিথের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।' বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এক টুইটবার্তায় বলেন, 'ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ওয়াসেনর অ্যারেঞ্জমেন্টের প্লেনারিতে ভারতের নাম বিয়াল্লিশতম সদস্য হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে।

এর জন্য আমরা ওয়াসেনর অ্যারেঞ্জমেন্টের বাকি একচল্লিশটি সদস্যরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ পরিষদের সদস্যপদ লাভ করার পর এটি ভারতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সাফল্য। এর আগে ভারত ২০১৬ সালে এম টি সি আর-এর সদস্যপদ অর্জন করেছিল।'

এদিকে ওয়াসেনর অ্যারেঞ্জমেন্টে ভারতের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। এই সাফল্য নিঃসন্দেহে আটচল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার গ্রুপের (এন এস জি) সদস্যপদ পেতে ভারতকে সাহায্য করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, চীন ওয়াসেনর অ্যারেঞ্জমেন্টের সদস্য নয় এবং চীনই এন এস জি-তে ভারতের সদস্যপদ প্রাপ্তিতে একমাত্র বাধা। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত, ওয়াসেনর অ্যারেঞ্জমেন্টের সাফল্য চীনকে মারাত্মক চাপে রাখবে।

পাটনায় লালুর পারিবারিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০০৫-এ রেলমন্ত্রী থাকাকালীন লালুপ্রসাদ যাদব রেলের সংস্থা আইআরসিটিসি-এর বিভিন্ন হোটেলের দেখভালের কাজে যে সংস্থাকে নিয়োগ করেছিলেন সেই নিযুক্তিতে বেআইনি মানি লন্ডারিং-এর আওতায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। সাম্প্রতিক সংবাদসূত্র অনুযায়ী, পাটনার অভিজাত সাগুনা মোড় অঞ্চলে লালু পরিবারের নামে থাকা তিন একর জমি এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বাজোয়াপ্ত করেছে। গত সপ্তাহেই এই সূত্রে ইডি আধিকারিকরা লালুপত্নী রাবড়িদেবীকে দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা জেরা করেছিলেন। ইডি এর তরফে দাখিল করা এফআইআর অনুযায়ী রাঁচী ও পুরীতে থাকা আই আর সি টি সি-এর হোটেলগুলির তদারকির কাজে লালু 'সুজাতা হোটেল'কে অন্যায় সুবিধে পাইয়ে দেন। এই সুযোগ পাওয়ার কৃতজ্ঞতা হিসেবে তারা 'দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিতে'

উল্লেখিত সাগুনা মোড়ের জমি ২০০৫ সালে লালুর মন্ত্রিত্বকালে এক গোপন লেনদেনের মাধ্যমে বেনামে হাতবদল করে।

প্রাথমিকভাবে, জমিটি ডিলাইট মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ১.৯ কোটি টাকার দলিল করে রেজিস্ট্রি হয়। আজকের দিনে ওই সম্পত্তির বাজার দর প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। এর পরই এই ডিলাইট কোম্পানি নাম বদলে লারা প্রজেক্টস নাম ধারণ করে। সেটা ২০১৬ সাল, এই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হন রাবড়ি দেবী ও তৎকালীন বিহার সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী প্রসাদ যাদব যিনি বর্তমানে বিরোধী দল নেতা। এই সংস্থায় রাবড়ির অংশীদারিত্ব ৮৫ শতাংশ ও তেজস্বীর ১৫। সূত্রে প্রকাশ, আদতে এই ডিলাইট মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড ও লারা প্রজেক্টস দুটিই লালু পরিবার চালিত শেল কোম্পানি। বর্তমানে, এই জমির ওপর একটি বহুতল মল যেখানে এ তারা হোটেল, বিলাসবহুল অফিস, এক হাজার দোকান তৈরি শুরু করেছিল **Mefidian construction** নামের এক সংস্থা যেটির মালিক লালুর আর জে ডি দলের বিধায়ক আবু দোখানা। কেন্দ্রীয় পরিবেশ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞায় গত মে মাস থেকে এই মলের নির্মাণকার্য স্থগিত রাখা হয়েছে বলে খবর।

শ্রীলঙ্কার হেমব্যানটোটা বন্দর লিজ নিল চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একটি বিরলতম সিদ্ধান্তে শ্রীলঙ্কা তাদের হেমব্যানটোটা বন্দর ৯৯ বছরের লিজে চীনের হাতে তুলে দিয়েছে। চীনের কাছ থেকে নেওয়া ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ শোধ করার জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে! শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী বেনিল বিক্রম সিঙ্ঘে সংসদে বলেন, 'এই চুক্তির মাধ্যমে আমরা ঋণশোধের প্রক্রিয়া শুরু করলাম। হেমব্যানটোটা বন্দরকে ভারত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।' তিনি আরও জানান, 'অত্যাধুনিক বন্দরের পাশাপাশি আমরা এখানে একটি ইকোনোমিক জোন তৈরি করব। গড়ে তোলা হবে আনুষঙ্গিক শিল্পও। এর ফলে শ্রীলঙ্কার পর্যটন শিল্পে গতি আসবে।' স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীলঙ্কার বিরোধী দলগুলি এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। তাদের বক্তব্য, ঋণশোধের নামে সরকার দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কার বন্দরে চীনের নৌসেনাদের উপস্থিতিতে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, দিল্লির এই আশঙ্কার জবাবে বিক্রম সিঙ্ঘে জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কার বন্দরে চীনকে নৌঘাঁটি বানাতে দেওয়া হবে না

উবাচ

"গুগল কখনই গুরুর বিকল্প হতে পারবে না। গুরু শুধু শিক্ষাই দেন না, বিষয়টির গভীরে গিয়ে শিক্ষায় পূর্ণতা এনে দেন।"

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের সম্মেলনে বক্তব্য প্রসঙ্গে

বেঙ্কাইয়া নাইডু
ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

"যে-কোনো হত্যা বা মৃত্যুই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের রাজনীতি হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে এখানে কোনো হত্যাই হয় না। মৃতব্যক্তি সংখ্যালঘু বলেই আদিখ্যেতা-ন্যাকামির চূড়ান্ত হচ্ছে।"

আফরাজুল হত্যার পর রাজনীতি প্রসঙ্গে

দিলীপ ঘোষ
সভাপতি, রাজ্য বিজেপি

"আপনারা মানুষের দ্বারে দ্বারে যান। মদের কুপ্রভাব সম্পর্কে বোঝান। দেশে মদ নিষিদ্ধ করাটাই হবে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা।"

দিল্লিতে দলের কর্মীসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে

নীতীশ কুমার
মুখ্যমন্ত্রী, বিহার

"কংগ্রেস হারলেই ইভিএম-এর দিকে আঙুল তোলে। জিতলে চুপচাপ থাকে। পঞ্জাব বিধানসভার ভোটে জয়ের পর এবং দিল্লি বিধানসভা ভোটে বিজেপির হারের পর কংগ্রেসের মনে হয়েছিল ইভিএম ঠিক ছিল।"

গুজরাট বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের অভিযোগ প্রসঙ্গে

জিতেন্দ্র সিংহ
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

সাদা টাকায় পার্টি ফান্ড হয় নাকি!

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুপ্রিমো, তৃণমূল কংগ্রেস
তৃণমূল ভবন, তপসিয়া, কলকাতা

৬ ডিসেম্বর ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের 'আদিখ্যেতা' দিবস। বিধানসভা ভবন ডাঙার কুকীর্তি যাদের অতীত তারা কিনা রামমন্দিরের পুরনো সৌধ ভেঙে ফেলার বিরোধিতা করে। মুসলমান তোষণ করা যাদের কাজ তারা আবার সংহতি দিবস করে।

সরি দিদি, এসব কথা আমার নয়। আমি লিখে ফেলেছি। আসলে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ এই রকম বললেও বলতে পারেন। ওনার যে সত্য বলার সাহস রয়েছে সেটা আমার নেই। থাকার কথাও নয়।

যাই হোক, পবিত্র সংহতি মঞ্চে আপনি একটি সারসত্য বলেছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ। তৃণমূল নেত্রী আপনি সেদিন বলেন, ''নির্বাচন কমিশন তো বলেছে, ২৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভোটে খরচ করা যেতে পারে। ভোটের খরচ কেউ কি আর নিজের পকেট থেকে করে? চাঁদা তুলেই করে। এক লাখ টাকা কেউ যদি জোর করে দিতে চায়, কী করবে? ওঁরা তো আর টাকা চাননি!''

আমার মতো সকলেই বুঝেছে যে নারদ টিভির টাকা নেওয়া নিয়েই আপনার এই বক্তব্য। অতীতে নারদ ফুটেজকে জাল বলা থেকে সাজানো ঘটনা— অনেক কিছুই দাবি করেছে আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস। নানা কথা বলেছেন আপনিও। কিন্তু কখনও ভোটের জন্য 'চাঁদা' নেওয়া হয়েছে এমন মন্তব্য করেনি দলের কেউ। এবার সেটাই প্রকাশ্যে বললেন দিদি আপনি।

আপনি এও জানিয়েছেন যে, ইতিমধ্যেই নারদ টিভির থেকে নেওয়া টাকার হিসেব অভিযুক্তরা নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছেন। আপনার ভাষায়, ''সব নথি তো ওরা জমা দিয়েছে। বিষয়টা তো দেখার দায়িত্ব কমিশনের।''

আপনার এই সরল স্বীকারোক্তি নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। দলের যে অংশ নারদকাণ্ডে অভিযুক্ত নন, তাঁদের বক্তব্য, এমনিতেই নারদ নিয়ে বার বার বয়ান বদল করে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এখন দলনেত্রী 'ঘুষ'-কে 'চাঁদা' হিসেবে দেখিয়ে যাঁরা অভিযুক্ত নন, তাঁদেরও অসম্মানিত করলেন।

কিন্তু আমার প্রশ্ন, হঠাৎ এই প্রসঙ্গ টেনে আনলেন কেন! তাহলে কি আপনি ভয় পাচ্ছেন! সেদিন আপনি এমনটাও জানিয়েছেন যে, আপনার কাছে বারবার আয়কর দপ্তর হিসেব চেয়ে চিঠি দিচ্ছে। আপনার দলে অনেক কালোটাকা আছে নাকি! সেগুলো 'ঘুষ' না 'চাঁদা' আপনিই জানেন।

সম্প্রতি আম আদমি পার্টিকে ৩০.৬৭ কোটি টাকার আয়কর নোটিস পাঠিয়েছে আয়কর দপ্তর।

তারা জানিয়েছে, আম আদমি পার্টিকে ৩৪ বার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ৩৬.৯৫ কোটি টাকার অনুদান নিজেদের ওয়েবসাইটে ঘোষণা করেনি আপ। বারবার জানতে চাওয়া সত্ত্বেও তারা অনুদানের তথ্য ঘোষণা করেনি। এর পরেই আয়কর দপ্তর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আয় ও অনুদান গ্রহণের তথ্য গোপন করার অভিযোগে আম আদমির বিরুদ্ধে জরিমানা ধার্য করার প্রক্রিয়া চালু করে।

গত সাধারণ বাজেটের সময়েই দেশের রাজনৈতিক দলগুলির আয়ের উপরে আয়কর দপ্তর নজর রাখবে বলে জানিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। সেই সময়েই অনেক রাজনৈতিক দল এর প্রতিবাদ করে। আপের মতো তৃণমূল কংগ্রেসও প্রতিবাদ করে। তাই আপনাকে পাঠানো নোটিসে আপনিও কি সিঁদুরে মেঘ দেখছেন?

কয়েক মাস আগেই একটি হিসেবে দেখা যায়, এক দশকে দেশের স্বীকৃত জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সম্পদ বৃদ্ধির শতাংশ হিসেবে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। তাদের সম্পদ বৃদ্ধির হার বিজেপি বা কংগ্রেসের মতো প্রকৃত অর্থের জাতীয় দলগুলির চেয়েও বেশি। নির্বাচন কমিশন, আয়কর দপ্তর-সহ সংশ্লিষ্ট নানা বিভাগে রাজনৈতিক দলগুলির দাখিল করা হিসাবের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করে বেসরকারি সংস্থা 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্ম' (এডিআর)।

কলকাতা কেন্দ্রিক আর একটি সংস্থা 'ইলেকশন ওয়াচে'র পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নিয়ে তৈরি করা ওই রিপোর্টে দেখা যায়, ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে বিজেপির ঘোষিত সম্পত্তি বেড়েছে ৬২৭.১৫ শতাংশ। সিপিএমের বেড়েছে ৩৮৩.৪৭ শতাংশ। ওই সময়ের মধ্যে তৃণমূলের সম্পত্তি বেড়েছে ১৭,৮৯৬ শতাংশ!

দিদি জবাব তো দিতেই হবে।
আজ নয়, কাল।

—**সুন্দর মৌলিক**

মানবাধিকার দিবসে সঙ্কল্প, চীনের জিনিস কিনব না

ছন্দা ভড়

বর্তমানে ভারত পৃথিবীর সব থেকে দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির দেশ। প্রায় ৭.১ শতাংশ বার্ষিক দর বিশ্বের ২০০টি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। তা সত্ত্বেও, ভারতে রোজগারের সুযোগ সেই হিসাবে বৃদ্ধি হচ্ছে না। বিভিন্ন পেশাদার এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজের জন্য আজ আমাদের দেশে পর্যাপ্ত চাকরির সুযোগ নেই; আর যারা অল্প বা মাঝারি শিক্ষিত তাদের অবস্থা তো আরও খারাপ। এর অন্যতম কারণ আমরা রেডিমেড জিনিস কিনি। এতে আমাদের দেশের কল-কারখানা বন্ধ হতে বসেছে। বেশ কিছু দেশের রেডিমেড জিনিস আমাদের বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে চটপট বিক্রি হয়ে যায়। কারণ ওইসব জিনিস চটকদার, দাম কম এবং বাকিটা বিজ্ঞাপনের দৌড়। আমরা যেসব দেশের জিনিস কিনে থাকি, তাতে ওইসব দেশের কোম্পানির লাভ হচ্ছে আর আমাদের কল-কারখানা, শিল্প সব বন্ধ হতে বসেছে। ফলে, চাকরির বাজারও দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে এবং অর্থব্যবস্থায় গতি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে চীন নিজেদের দেশের কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে, কম মজুরি দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে নেয়। এছাড়া, প্রচুর ভরতুকি দিয়ে প্রকৃতি এবং পরিবেশের ক্ষতি করে নিজেদের তৈরি নিম্নমানের সস্তা জিনিস ভারতের বাজারে বিক্রি করে। এভাবে চীন প্রত্যেক বছর প্রচুর টাকা ভারত থেকে উপার্জন করে, পরিবর্তে ভারতেরই ক্ষতি করে চলেছে। চীন খোলাখুলি পাকিস্তানকে সমর্থন করে চলেছে, যাতে ভারতে সন্ত্রাস ও অস্থিরতা বজায় থাকে। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে ৪৩,০০০ বর্গকিলোমিটার জমি কবজা করেও শান্তি হয়নি, এখন অরুণাচল প্রদেশের ৯০,০০০ বর্গকিলোমিটার জমি অধিকার করতে চাইছে। সুতরাং আমাদের এবার সতর্ক হতে হবে। আমরা যে অর্থ পরোক্ষ ভাবে চীনকে দিচ্ছি, তাই দিয়ে চীন আমাদের দেশকে ধ্বংস করার নিকৃষ্ট প্রয়াস করে চলেছে।

আমাদের দেশের সঙ্গে ১৯০টি দেশের ব্যবসায়িক সম্বন্ধ আছে। এদের মধ্যে সবথেকে বেশি ব্যবসা হয় চীনের সঙ্গে। ভারত থেকে চীনে ৯ বিলিয়ন ডলারের জিনিস রপ্তানি হয় এবং চীন থেকে ভারতে ৬১.৭ বিনিলয়ন ডলারের জিনিস আমদানি হয়, অর্থাৎ প্রতি বছর ৫২.৭ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি থাকে। টাকার হিসাবে এর মূল্য হলো প্রায় ৩৪২৫০০ কোটি টাকা।

চীন থেকে আমদানি করা জিনিস ভারতে তৈরি জিনিসের প্রায় ২৪ শতাংশের সমান, অর্থাৎ চীন থেকে সামগ্রী আমদানি করার জন্য আমাদের দেশের উৎপাদন এবং রোজগার প্রায় এক চতুর্থাংশ কম হয়। সেজন্য আমাদের স্বদেশি জিনিস কেনা এবং ব্যবহার করা উচিত। স্বদেশি জিনিসের দাম একটু বেশি হলেও তাতে আমরা যে অর্থ বিনিয়োগ করি, তা আমাদের দেশের যুবসমাজের উপার্জন বাড়াতে সাহায্য করবে।

এখন তিব্বতিরাও চীনের জিনিস বর্জনের জন্য আবেদন জানাচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে তিব্বতি যুবা কংগ্রেস রণনীতি তৈরি করে গত ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে পশ্চিমবঙ্গ, ম্যাকলয়েডগঞ্জ এবং চেন্নাই থেকে জাগরণ অভিযান শুরু করেতে চলেছে। তিব্বতি যুব কংগ্রেসের অধ্যক্ষ তেংজিন জিগ্‌মে জানিয়েছেন যে, ভারত এবং তিব্বতের মধ্যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ব্যবসায়িক সম্বন্ধ অতীতকাল থেকেই ছিল। তিব্বতের সীমানা এবং এর অর্ন্তরাষ্ট্রীয় স্থিতি ভারতের জন্য অনুকূল। ১৯৪৯ সালে চীনের আক্রমণের পরে তিব্বতের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে এবং তিব্বতিরা শরণার্থী হয়ে ভারতে আসার পরে ভারত-তিব্বত সীমান্তে অস্থিরতা বেড়ে চলেছে। তিনি জানিয়েছেন যে, চীন সরকার এন এস জি-তে ভারতের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে সংযুক্ত রাষ্ট্র সুরক্ষা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে ভারতের চয়নে বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে। তিব্বত যুবা কংগ্রেসের অধ্যক্ষ বলেছেন যে, তিব্বতে বাঁধ তৈরি করে নদীর স্রোত পরিবর্তিত করে এবং জঙ্গল কেটে ফেলার ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য দিনে দিনে খারাপ হতে থাকবে। তিনি জানিয়েছেন যে, তিব্বত স্বাধীন হলে হিমালয় পর্বতাঞ্চল এবং ভারতের শান্তি-সুরক্ষা বজায় থাকবে। সেজন্য চীনকে আর্থিকভাবে ভারত এবং তিব্বতের পক্ষ থেকে লাভান্বিত হতে দেওয়া যাবে না।

ভারত এবং চীন দুটি দেশই আণবিক অস্ত্রযুক্ত হবার জন্য প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সম্ভাবনা কম। এখন হলো বাণিজ্যিক যুদ্ধ (War of Trade, War of Economics)।

বর্তমানে নানাভাবে চীন ভারতের ক্ষতিসাধন করে চলেছে। সেজন্য বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে তিব্বতি সমাজের সঙ্গে প্রকৃত ভারতবাসীর অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে চীনের তৈরি জিনিস বর্জনের মাধ্যমে।

মিডিয়া যতই বাজনা বাজাক, গুজরাটে জেতার ক্ষমতা রাহুলের নেই

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

গুজরাটে বিধানসভার ভোটগ্রহণ পর্বের ঠিক এক সপ্তাহ আগে কলকাতার একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র তাদের করা একটি নির্বাচনী সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। এই সমীক্ষায় তারা দেখিয়েছে, গত আগস্ট মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত গুজরাটে বিজেপির পক্ষে জনমত ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এবং এখন এই মুহূর্তে কংগ্রেসের পক্ষে জনমত বিজেপির জনমতকে ছুঁয়ে ফেলেছে। এই বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রটি সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করে এই মতামত দিয়েছে যে, নরেন্দ্র মোদী যে রাজ্যের মানুষ সেই গুজরাটেই বিজেপি পায়ের তলার জমি হারাচ্ছে। আর সেই জমি দখল করছেন কংগ্রেসের নব্য সভাপতি রাহুল গান্ধী। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে— গুজরাটের ১৮২টি বিধানসভা কেন্দ্রের কতজন ভোটারের ভিতর এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে? সে হিসেবও অবশ্য পেশ করেছে এই সংবাদপত্রটি। তারা জানিয়েছে, ৫০টি বিধানসভায় ২০০টি বুথে মাত্র ৩৬৫৫ ভোটারের মধ্যে করা সমীক্ষার ফল তারা প্রকাশ করেছে। এবার এ প্রশ্নও উঠবে যে, গুজরাটের মোট ভোটারের ভিতর এই ৩৬৫৫ ভোটার কোনো শতাংশে আসে কি? যদি না আসে তাহলে তাদের মতামতকে গুজরাটের জনমত বলে চালানোর এই চেষ্টা কেন? এই সংবাদপত্রটি যেদিন তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় এই সমীক্ষা রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে, সেইদিনই ওই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় এক উত্তর সম্পাদকীয় লেখক বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন এক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং গুজরাট রাজ্য-রাজনীতির এক বিশিষ্ট বিশ্লেষকের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে লিখেছেন, 'গুজরাট ভোটের সম্ভাব্য পরিণাম আগাম আন্দাজ করার কাজটা আত্মবিশ্বাসী ভোটবিজ্ঞানীর পক্ষেও কঠিন হয়ে যাচ্ছে।' ওই উত্তর সম্পাদকীয় লেখক এমনও বলেছেন যে, গুজরাটে বিজেপির পায়ের তলা থেকে জমি সরে যাচ্ছে— এরকম কথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। অর্থাৎ এই বাজারি সংবাদপত্রটির প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে যে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে— তাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন ওই পত্রিকারই এক স্তম্ভ লেখক। প্রশ্ন আরও— শতাংশের হিসেবেই আসে না এমন গুটিকয় ভোটারকে জুটিয়ে সমীক্ষা করা হলো কেন? সামান্য সংখ্যক ভোটারের ওপর করা সমীক্ষা দেখে এই সন্দেহই জাগে--- পরিকল্পনা করেই এমন ভোটারদের জোটানো হয়নি তো— যারা শুধু নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করবেন?

এই সংবাদপত্রটি মাত্র কিছুদিন আগে গুজরাটের একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্ঘের ছাত্র শাখা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পরাজয়কে ফলাও করে ছাপিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিল— গুজরাটে ছাত্র ও যুবদের ভিতর নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির জনপ্রিয়তা কমছে। অবশ্য ওই রাজ্যে অন্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যার্থী পরিষদের সাফল্যের খবর তারা প্রকাশ করেনি। এই সংবাদপত্রটিই উত্তরপ্রদেশে সদ্য অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত এবং নগরপালিকা নির্বাচনে বিজেপির অভূতপূর্ব সাফল্য নিয়ে একটি শব্দও ব্যয় করেনি। অথচ ওই নির্বাচনেই টিমটিম করে বহুজন সমাজ পার্টির মাত্র দুটি জায়গায় বিজয়ের কাহিনিকে প্রচার করে বোঝাতে চেয়েছে, বিজেপি জোর ধাক্কা খেয়েছে যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে এই সংবাদপত্রটিই ক্রমান্বয়ে প্রচার করে গিয়েছিল— রাহুল গান্ধী এবং অখিলেশ যাদবের জোট বিপুলভাবে উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় ফিরছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ জুটি। ঠিক এরকম প্রচারই গুজরাট নির্বাচনের সময় রাহুল গান্ধী-হার্দিক প্যাটেল-জিগ্নেশ মেভানির জুটির হয়ে করছে এই সংবাদপত্র। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও এরা একটি সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে বলেছিল— জিতছেন রাহুল এবং অখিলেশই। ফল প্রকাশ হওয়ার পর দেখা গেল কার্যত উল্টো হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে বিজেপি।

কথায় আছে--- নেড়া একবারই বেলতলায় যায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে এরা বারবারই বেলতলায় যাচ্ছে। এদের প্রকাশিত সংবাদ এবং বাস্তবকে পাশে রাখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না— এরা সত্যকে গোপন রেখে মিথ্যার বেসাতি করছে। কিন্তু কেন এরকম নির্লজ্জ মিথ্যার বেসাতি করছে? এই মিথ্যার বেসাতি করার দায়টা কী এদের? একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, যে দলটিকে সমগ্র দেশের মানুষ এখন বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছে, সেই কংগ্রেস এবং কংগ্রেস দলের বালখিল্য আচরণে অভ্যস্ত সভাপতি রাহুল গান্ধীর ভাবমূর্তিকে ঘষেমেজে উজ্জ্বল করে তোলাই এদের এখন একমাত্র লক্ষ্য। এবং সেই লক্ষ্যেই এরা যাবতীয় মিথ্যার বেসাতি করে প্রমাণ করতে চাইছেন রাহুলের জনপ্রিয়তার গতি ঊর্ধ্বমুখী। এই হাস্যকর প্রচেষ্টা এরা চালাতেই পারে। কিন্তু আদৌ কি ফলপ্রসূ হবে এদের সেই প্রচেষ্টা?

কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর আচার-আচরণ কিন্তু প্রমাণ করে দিচ্ছে তাঁবেদার সংবাদপত্রগোষ্ঠীর এই প্রচেষ্টা সফল হওয়ার নয়। বরং রাহুল নিজেই প্রমাণ

করে দিয়েছেন— গুজরাটে নির্বাচনের আগেই তিনি হেরে বসে রয়েছেন। এবং নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটাই অনিশ্চিত এবং আশঙ্কিত রাহুল যে, খড়কুটোর মতো তিনি সামনে যা পাচ্ছেন— তাই ধরে ভেসে উঠতে চাইছেন। একটু খেয়াল করে দেখুন— গুজরাটের নির্বাচনে এ পর্যন্ত কী কী করেছেন রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের এই নতুন প্রজন্মের নেতা গুজরাটে ভোট লড়তে এসে প্রথমেই হাত মিলিয়ে ফেললেন হার্দিক প্যাটেল, জিগ্নেশ মেভানি এবং অল্পেশ ঠকরের মতো জাতপাতভিত্তিক নেতাদের সঙ্গে। যে রাহুল দেশকে নতুন দিশা দেখানোর কথা বলেন, তিনি ভোটে জিততে জাতপাতের রাজনীতির সঙ্গে হাত মেলাতে যাবেন কেন? জাতপাতের এই ঘৃণ্য রাজনীতি কোন নতুন দিশা দেখাতে পারবে দেশকে? রাহুল কি বোঝেন না— এই জাতপাতের রাজনীতিতে মদত দিয়ে, এই জাতপাতের রাজনীতির শরিক হয়ে— দেশের ভিতর বিভেদকে আরও উসকে দেওয়াই হয়। গুজরাটের নির্বাচনে হার্দিক প্যাটেল-অল্পেশ ঠকরেদের মতো জাতপাতভিত্তিক নেতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাহুল এটাই প্রমাণ করলেন— মুখে যতই হাতি-গণ্ডার মারুন না কেন, ভোটে জিততে মায়াবতী-লালুপ্রসাদের মতো ঘৃণ্য জাতপাতের রাজনীতিকে তাস করতে পিছপা নন তিনি— এটা তিনি নিজেই প্রমাণ করলেন। যদি নতুন দিশা তিনি দেখাতেই চাইবেন, তাহলে কেন বললেন, না— এই জাতপাতের রাজনীতিকে আমি সমর্থন করি না। কোনো অবস্থাতেই এই রাজনীতিকদের সঙ্গে আমি হাত মেলাবো না। যদি বলতেন, তাহলে জাতীয় রাজনীতিতে কিছুটা হলেও শ্রদ্ধা তো অন্তত তিনি পেতেন। সমস্যা হলো— সাহস করে একথা রাহুল কখনই বলতে পারবেন না। কারণ, রাহুল নিজেই জানেন, বাজনদাররা তাঁর হয়ে যতই বাজনা বাজাক না কেন— গুজরাটে জিতে আসার ক্ষমতা তাঁর নেই। জিতবেন— সেই আত্মবিশ্বাসেও তাঁর ঘাটতি আছে। অতএব অনিশ্চিত এবং আশঙ্কিত রাহুল আঁকড়ে ধরলেন জাতপাতের রাজনীতি।

নিজের আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি আরও কীভাবে প্রমাণ করে দিলেন রাহুল। গুজরাটের ভোটের দিনক্ষণ দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়ার পর রাহুল আচমকাই নিজেকে 'সাচ্চা হিন্দু' প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অথচ এই নির্বাচনী পর্বে রাহুলের কাছে তাঁর হিন্দুত্বের প্রমাণ কেউ চায়নি। গুজরাটের যে সোমনাথ মন্দির সম্পর্কে রাহুলের প্রপিতামহ জওহরলাল নেহরু অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন, ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে সোমনাথ মন্দির পরিদর্শনে যাওয়ায় বিরক্ত হয়েছিলেন নেহরু— গুজরাটে নির্বাচনী প্রচার পর্বে সেই মন্দিরেই ঘটা করে পুজো দিয়ে এলেন রাহুল। শুধু এই একটি মন্দিরেই নয়, আর অনেক মন্দিরের দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন তিনি। কংগ্রেসের নেতাদের দিয়ে ঘোষণা করালেন— তিনি খাঁটি হিন্দু। পৈতে পরেন এবং শিব পূজা করেন। রাহুল এইরকম আচরণ করলেন, কারণ, গুজরাটের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটার আদৌ তাঁকে ভোট দেবে কিনা— তা নিয়ে সংশয় এবং সন্দেহে আছেন তিনি। আত্মবিশ্বাসের সেই ঘাটতিই তিনি প্রকাশ করে ফেললেন এই আচরণে।

অথচ গুজরাটের ভূমিপুত্র নরেন্দ্র মোদীকে কিন্তু এসব করতে হয়নি। নরেন্দ্র মোদী হার্দিক প্যাটেল, জিগ্নেশ মেভানি, অল্পেশ ঠকরেদের মতো জাতপাতভিত্তিক নেতাদের সঙ্গে হাত মেলাতে যাননি গুজরাটে। মোদী জানেন, যে গুজরাটকে তিনি একটি সমৃদ্ধ রাজ্য হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন সমগ্র দেশের সামনে, সে গুজরাটে জাতপাতের রাজনীতিকে মদত দেওয়ার অর্থ হলো, ওই রাজ্যটিকেই পিছনে টেনে ধারা। মোদী জানেন, যে সমৃদ্ধ এবং উন্নত ভারত গড়তে তিনি বদ্ধপরিকর— তার সঙ্গে এই জাতপাতের রাজনীতি খাপ খায় না। এই জাতপাতের রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে ভোটে জেতা যাবে— এই আত্মবিশ্বাস নিজের আছে বলেই হার্দিক প্যাটেল-অল্পেশ ঠকরেদের হাত ধরতে যাননি মোদী। নিজেকে নতুন করে হিন্দু প্রমাণ করার দায়ও মোদীর নেই। তাঁর আচার-আচরণ এবং সঙ্ঘের পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠার ভিতর দিয়েই মোদী অনেকদিন আগেই প্রমাণ করেছেন তিনি একজন খাঁটি হিন্দু। দেশের প্রতিটি মানুষ, এমনকী বিশ্ববাসীও জানেন— মোদী হচ্ছেন ভারতের প্রথম একশো শতাংশ খাঁটি হিন্দু প্রধানমন্ত্রী। তিনি প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি ঢাকা গিয়ে হিন্দুদের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মস্থান ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করেছেন। অতএব ভোটের আগে তাঁকে হিন্দু সেজে নতুন করে হিন্দু মন জয় করতে আসরে নামতে হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু তাঁর পাশেই আছে। সেই আত্মবিশ্বাস মোদীর আছে।

নিজের ওপরই যাঁর কোনো ভরসা নেই, যে মানুষটি আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি হারিয়েছেন, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন— শুধু প্রচারের বেলুন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তাঁকে কি প্রতিষ্ঠা করা যায়? এ চেষ্টা তো কিছু কম হয়নি। বরং সেই ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে এ পর্যন্ত সেই চেষ্টা সমানে চলছেই। লাভের লাভ অবশ্য কিছু হয়নি। বরং যত দিন যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের এই সভাপতির ওপর থেকে দেশের মানুষের আস্থা দ্রুত কমছে। সেই আস্থা অচিরেই ফেরার কোনো আশা নেই। কিন্তু এই যে বাজনদার সংবাদমাধ্যম রাহুলের হয়ে ঢাক পেটাতে বাজারে নেমে পড়ল— তাদের কী হবে? তাদের প্রকাশিত সংবাদের সঙ্গে এখন তথ্য মিলিয়ে দেখলে মানুষের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না— এরা সত্য সংবাদ প্রকাশ করতে বাজারে আসেনি। বরং সত্যকে চেপে দিতে এরা আসরে অবতীর্ণ হয়েছে। সংবাদপত্র সম্বন্ধে পাঠকের এই ধারণাটি কি হওয়া ভালো? তাতে তো সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষিত হয় না। এই বিশ্বাসযোগ্যতাই তো সংবাদপত্রের চাবিকাঠি। এই বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েই তো সে পাঠকের মন জয় করে। সেই বিশ্বাসযোগ্যতাই যদি ধ্বংস হয়ে যায়— তাহলে পাঠক সংবাদপত্র পড়বে কেন?

তলানিতে পৌঁছে যাওয়া বিশ্বাসযোগ্যতার রাহুল গান্ধীর বাজনদাররা এইটুকু বুঝছেন না, তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাও যে তলানিতে পৌঁছেছে। ■

পাহাড়ে অদৃশ্য বিমল গুরুং ক্রমশই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে

সাধন কুমার পাল

লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেও পাহাড়ের রাজনীতিতে বিমল গুরুং দৃশ্যমান। মামলার পাহাড় তুলে, মাছি গলতে না দেওয়ার মতো পুলিশি পর্যবেক্ষণ বলয় গড়ে তুলে, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা থেকে 'সাসপেন্ড' করেও পাহাড়ে বিমল গুরুংয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাচ্ছে না। বিশদ ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে পাহাড়ের রাজনীতির ময়দানে এখন দুটোই মুখ— একজন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপরজন বিমল গুরুং। বাকিরা মুখোশ।

দলনেত্রী নিজের দলের মধ্যে যে ভাবে কাউকে ডেকে এনে কোনো পদে বসিয়ে দেন ঠিক একই কায়দায় ২০ সেপ্টেম্বর নবান্ন থেকে জিটিএ পুনর্গঠন ও দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে বিনয় তামাং ও অনীত থাপাকে মাথায় বসিয়ে আটজনের টিম ঘোষণা করে দিলেন। এই টিমের একজন সুবাস ঘিসিংয়ের পুত্র মন ঘিসিং প্রথম প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন তাকে না জানিয়ে এটা করা হয়েছে বলে তিনি এই টিমে থাকতে চান না। টিমের প্রধান খোদ বিনয় তামাংয়ের প্রথম প্রতিক্রিয়া থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল এই ঘোষণার ব্যাপারে তিনিও বিশেষ ওয়াকিবহাল নন।

এই সমস্ত প্রতিক্রিয়া থেকেই স্পষ্ট পাহাড়ের মানুষকে অন্ধকারে রেখে কিছু বিশেষ রাজনৈতিক এজেন্ডা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পছন্দের কিছু লোককে পাহাড়ের ক্ষমতার অলিন্দে বসিয়ে দিয়েছেন। সেই এজেন্ডা যে পথের কাঁটা 'অবাধ্য' বিমল গুরুংকে পাহাড়ের রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই এজেন্ডার অঙ্গ হিসেবে ২০ নভেম্বর পিন্টেল ভিলেজে পাহাড় নিয়ে সর্বদল বৈঠকে প্রত্যাশা মতোই ফেরার বিমল গুরুং ও রোশন

গিরিকে দল থেকে 'সাসপেন্ড' করে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিনিধিত্ব করলেন বিনয় তামাং ও অনীত থাপা। পাহাড়ের জন্য কল্পতরু হয়ে শুধু উন্নয়ন নয় সাম্প্রতিক হিংসায় মৃতদের পরিবারকে অর্থ সাহায্য, চাকরি, আহতদের অর্থ সাহায্য, বন্‌ধে ক্ষতিগ্রস্তদের নানা সহায়তার কথা ঘোষণা করে পাহাড়ের মন জয়ের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী উজাড় করে দিলেন রাজ্য সরকারের ঝাঁপি।

বর্তমানে জনজীবন স্বাভাবিক থাকলেও পাহাড়ে কান পাতলেই কানাঘুসো শোনা যায় বিমলপন্থীদের সন্দেহ হলেই নাকি নানারকম মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, হেনস্থা করা হচ্ছে পুলিশ দিয়ে। প্রত্যেক জনবসতিতেই এমন অনেককেই পাওয়া যাবে যারা ইতিমধ্যেই মিথ্যে মামলার জেরে জেরবার। আবার বিনয়পন্থী হওয়ার মুচলেকা দিয়েও নাকি অনেকে মামলার ফাঁস থেকে সাময়িক রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন।

রাজ্য সরকারের দেওয়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দখল নিলেও পাহাড়ে বিনয় তামাং অনীত থাপাদের নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক ভিত্তি এখনো তৈরি হয়নি। উন্নয়নের নামে পাহাড়ে প্রচুর বরাদ্দ যাচ্ছে। ফলে বিনয় তামাং অনীত থাপাদের ঘিরে যে 'মৌচাক' তৈরি হবে এবং ওদের ডাকা সভায় যে ভিড় হবে এটাই স্বাভাবিক। যে বৈঠকে গুরুংদের সাসপেন্ড করেছেন বিনয়রা, সেখানেও কেন্দ্রীয় কমিটির অর্ধেকের বেশি সদস্য আসেননি। কমিটি ৯২ জনের। দল ছেড়েছেন তিনজন। মারা গিয়েছেন আরও তিন। এখন কার্যকর সদস্য সংখ্যা ৮৬-র মধ্যে ৩৭ জনকে নিয়ে বৈঠক করেন বিনয়-অনীত। সেই বৈঠকে বিমল গুরুং, রোশন গিরিকে 'সাসপেন্ড' করে নিজেরা (বিনয়-অনীত) সেই পদে বসেছেন। যাঁদের সামনে রেখে বিমল গুরুং দীর্ঘদিন পাহাড়ে শাসন চালিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দার্জিলিঙের সতীশ পোখরেল, কার্শিয়াংয়ের অনীত থাপা ছাড়া আর কেউ এখনো পর্যন্ত বিনয়ের পাশে দাঁড়াননি। সাসপেন্ড সদস্যদের বাদ দিলেও পাহাড়-ডুয়ার্স মিলিয়ে আরও ৩৬ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রয়েছেন, যাঁরা বিনয়ের বৈঠকে যাননি।

দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হলেও গোর্খাল্যান্ড ইস্যুর জন্য এখানে রাজনীতির একটি স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠেছে। সমতলে গোর্খাল্যান্ডের পক্ষে কথা বললে তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আবার পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ডের বিপক্ষে কথা বললে ওখানে বসবাস করাই অসম্ভব। এই বৈপরীত্যের জন্য রাজনৈতিক ভাবে পাহাড় সমতল একে অপরের প্রতিপক্ষ। পাহাড়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমতলের রাজনীতিবিদদের তৎপরতা পাহাড়বাসীর

চোখে দাদাগিরি বা দিদিগিরির সমান। ঠিক এই কারণেই নেপালি ভাষী কিছু মানুষ বিচ্ছিন্ন ভাবে ডান বাম বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলগুলি পাহাড়ে কোনও সংগঠন তৈরি করতে পারেনি।

মনে হতে পারে এ ব্যাপারে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী ব্যতিক্রম। পাহাড়ে সংগঠন করে ভোটে লড়াই করে মিরিকের মতো পুরসভা দখল করে দেখিয়ে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে অর্থ ক্ষমতা প্রতিপত্তির একটি আলাদা প্রভাব ও আবেদন আছে। দু' একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে এই মতকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে যে অর্থলোভী ক্ষমতালোভী কিছু বিচ্ছিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষকে দিয়ে পাহাড়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে সাময়িক ভাবে আমজনতাকে বিভ্রান্ত করে ক্ষণস্থায়ী সাফল্য লাভ করলেও তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে পাহাড়ের মাটির কোনও সম্পর্ক নেই। বাংলাভাষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর একটি বিবৃতিকে কেন্দ্র করে বিমল গুরুং যখন বাজার গরম করছিলেন সে সময় পাহাড়ে পাল্টা বিবৃতি দেওয়ার মতো একজন তৃণমূলীকেও পাওয়া যায়নি। ভোটে জিতে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেও পাহাড়ে ১০৪ দিন ধরে লাগাতার বনধের মোকাবিলায় পাহাড়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে সামান্যতম রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেখা যায়নি। তৃণমূল কংগ্রেসে নাম লেখানো অনেকেই সমতলে আত্মগোপন করে থেকে শেষে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছে। বিমল গুরুংয়ের জায়গায় পাহাড়ের মুখ হিসেবে রাজেন মুখিয়ার মতো কোনো তৃণমূলীকে নয়, তুলে ধরতে হয়েছে বিমল গুরুংয়ের প্রাক্তন সঙ্গী দলছুট বিনয় তামাং অনীত থাপাদের। পাহাড়ের মানুষের বিশ্বাস অর্জনের জন্য তৃণমূলনেত্রী এই দুজনের গায়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার জার্সি পরিয়েই জিটিএ-র শীর্ষে বসিয়ে দিয়েছেন। তৃণমূলনেত্রীর সৌজন্যে জিটিএ প্রধান পদের মতো শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়ার পর বিনয় তামাংরা পাহাড়বাসীকে এটা বোঝাতে কোনও সুযোগই হাতছাড়া করছেন না যে গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতে কোনো সমঝোতা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ মূলত উন্নয়নের জন্যই।

রাজনীতির ময়দানে কখনোই পক্ষ প্রতিপক্ষের জোট হতে পারে না। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে 'সর্বশক্তি দিয়ে বাংলা ভাগ রুখব' ইস্যুতে সেন্টিমেন্টাল বাঙালি ভোট অত্যন্ত মূল্যবান। এই কারণেই তৃণমূল পুলিশ অফিসার অমিতাভ মালিকের রহস্য মৃত্যুকে বাংলার অখণ্ডতা রক্ষায় শহিদের মৃত্যু হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। আবার অন্যদিকে তৃণমূলনেত্রী বিজেপির হাত থেকে দার্জিলিং আসন ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য বিনয় অনীতকে সামনে রেখে উন্নয়নের কথা বলে যারা বাংলা ভাগ করে গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্নে বিভোর তাদের ভোটও নিজের ঝুলিতে পুরতে চাইছেন। অর্থাৎ গাছেরও খাবো তলারও কুড়াবো।

ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় দল। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন। কোনো রাজ্যের স্বার্থ ও আবেগের পরিপন্থী গোর্খাল্যান্ডের মতো কোনো আঞ্চলিক আশা আকাঙ্ক্ষা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতাতেই পূরণ হওয়া সম্ভব। এই কারণেই কিছু ব্যতিক্রম বাদে কেন্দ্র ও কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে আঞ্চলিক দলগুলির স্বাভাবিক সখ্য গড়ে উঠে। এজন্য এটা বলা যুক্তিসঙ্গত যে বিজেপির সঙ্গে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সখ্যে কোনো রাজনৈতিক অস্বাভাবিকতা নেই। এই পক্ষ প্রতিপক্ষ তথ্যের জন্যই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতে যতটা সহানুভূতিশীল বলে মনে হয় রাজ্য নেতৃত্বকে তার চেয়ে অনেক বেশি বিরোধী। গোর্খাল্যান্ডের পক্ষে ও বাংলা ভাগের বিপক্ষের আবেগ উভয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করা সর্বভারতীয় দল হিসেবে বিজেপির কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে যেমন গোর্খাল্যান্ড ইস্যুর বিপরীত মেরুতে থাকা রাজ্য বিজেপিকেও সামলাতে হচ্ছে ঠিক তেমনি সামলাতে হয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকেও। এই কারণেই দার্জিলিং লোকসভা আসন নিজেদের দখলে থাকা সত্ত্বেও পাহাড়ের রাজনীতিতে রাজ্য বিজেপি নিজেদের সংগঠন বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছে এমনটা শোনা যায়নি।

তবে বিজেপি পাহাড়ে সরাসরি রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী না হলেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-সহ অনেক হিন্দুত্ববাদী সংগঠনই সবার অলক্ষ্যে হিন্দুত্বের ভিত্তিতে নেপালিভাষী ও বাংলাভাষী মানুষের ঐক্য ধরে রাখার জন্য সামাজিক স্তরে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। এই দুই ভাষার মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হলে সামাজিক রসায়নের মাধ্যমেই গোর্খাল্যান্ড নামক রাজনৈতিক সঙ্কটের সবার জন্য স্বস্তিদায়ক সমাধান সম্ভব।

এক সময় বিমল গুরুং ও তৃণমূল নেত্রীর সম্পর্কের উষ্ণতা ছিল 'মাতা-পুত্রে'র মতো। কিন্তু পাহাড়ে 'মা'-এর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে না পেরে পুত্রকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয়। হিংসাত্মক হয়ে উঠে আন্দোলন। বিমল গুরুং হিংসাত্মক আন্দোলনের দায় অস্বীকার করে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের দাবি তোলেন। কিন্তু 'অবাধ্য' বিমল গুরুংকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া না করে এই বিদ্রোহী 'পুত্রকে' খাঁচায় পুরতে মামলার পাহাড় সাজিয়ে তোলা হলো। দেশদ্রোহিতার অভিযোগ থেকে শুরু করে কী নেই মামলার পাহাড়ে। ওয়াকিবহাল মহল ভালো করেই জানেন যে নানা অভিযোগের জেরে পাহাড়ের রাজনীতির স্বাভাবিক নিয়মে সুবাস ঘিসিংয়ের মতো বিমল গুরুংও ক্রমশই জনপ্রিয়তা হারিয়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতেন। ওই এলাকার রাজনীতির নিজস্ব নিয়মে হয়তো বা অন্য কেউ উঠে আসতো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বলছে গোর্খাল্যান্ডের ঘোর বিরোধী প্রতিপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর রোষ শহিদের ভাবমূর্তি লেপে দিয়ে বিমল গুরুংয়ের রাজনৈতিক পুনর্জন্ম ঘটিয়েছে। এখন সশরীরে উপস্থিত বিমল গুরুংয়ের চেয়ে অনুপস্থিত বিমল অনেক বেশি শক্তিশালী। রাজনীতির চেনা ছকেই দমবন্ধ হওয়া পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে পাহাড়বাসীর কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির ওপর নির্ভরতা বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক। ফলে পাহাড় নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা অধরা থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ■

একশো টাকায় তিরিশ টাকা সুদ মাসি, না নিলে পস্তাবে

চন্দ্রভানু ঘোষাল

বাঙালির আইকিউ খারাপ কেউ বলবে না। কিন্তু মামা-কাকা, মাসি-পিসি বলে ডেকে বাঙালিকে ঠকানো সব থেকে সহজ। বিশেষ করে কেউ যদি ভালো রিটার্নের কথা বলে তাহলে বাঙালি তলিয়ে দেখার কথা ভাবতেই পারে না। তখন পাড়ার চেনা ছেলেটির মুখের কথাই বেদবাক্য। অবশ্যই কথাটা সব বাঙালির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাঙালি সমাজের একটা বড়ো অংশই এরকম। যে কারণে পশ্চিমবঙ্গে চিটফান্ডের এত রমরমা।

গড়িয়ার স্বপন দত্তর (নাম পরিবর্তিত) উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে। স্বপনবাবু শিক্ষিত, সরকারি চাকরি করেন। তাঁর স্ত্রীও একটি স্কুলে পড়ান। ছেলে নামি সরকারি স্কুলে ক্লাস এইটের ছাত্র। স্বপনবাবুকে কিছুতেই গড়পড়তা শ্রেণীতে ফেলা যাবে না। কিন্তু তিনিও পাড়ার একটি পরিচিত ছেলের কথায় সারদার পনজি স্কিমে এক লক্ষ টাকা লগ্নি করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো তারও টাকা ডুবেছে। প্রশ্ন হলো, স্বপনবাবুর মতো উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মানুষ কেন হঠাৎ কিছু বাড়তি টাকার লোভে এমন ভুল করবেন? গরিব অশিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে একটা যুক্তি আছে যে তাদের যাচাই করার সুযোগ নেই, তাই তারা ফাঁদে পা দেন। ঠিক যেমন দিয়েছিলেন মিনতি বারুই। চার-পাঁচ বাড়িতে কাজ করে মাসের শেষে যা পান তা থেকে সংসার চালিয়ে হাতে বিশেষ কিছু থাকে না। এই সামান্য টাকায় খাতা খোলার কথা বললে ব্যাঙ্কের বাবুরা ভাগিয়ে দেন। যে সময়ের কথা তখনও জনধন প্রকল্প চালু হয়নি। এদিকে মিনতিরও কিছু টাকা ভবিষ্যতের জন্য না রাখলেই নয়। মেয়ে বড় হচ্ছে। এই সময়েই গ্রামের একটি ছেলে রোজভ্যালির কথা বলল। রোজভ্যালিতে টাকা রাখলে দু' বছরে নাকি ডবল! সুদ বোনাস ডিভিডেন্ট মিলিয়ে সে এক এলাহি ব্যাপার। ছেলেটা বলল, 'একশো টাকায় তিরিশ টাকা সুদ মাসি। এমন সুযোগ আর পাবে না। না নিলে কিন্তু পস্তাবে।' যে ছেলেকে জন্মাতে দেখেছেন তার কথা মিনতি অবিশ্বাস করেন কী করে। অগত্যা করলেন লগ্নি। সেই টাকা এখন বিশবাঁও জলে!

সম্প্রতি রাজস্থান পুলিশ পিনকন স্পিরিট লিমিটেডের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন রায়কে গ্রেপ্তার করেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি সাধারণ মানুষের ৫৬ কোটি টাকা তছরূপ করেছেন। গ্রেপ্তার হয়েছেন তার তিন সঙ্গীও। যদিও মনোরঞ্জন রায়ের মৃগয়াক্ষেত্র যত না পশ্চিমবঙ্গ তার থেকে অনেক বেশি রাজস্থান। এমনকী প্রতিবেশী কয়েকটি রাজ্যও তার শিকার। অভিযোগ, গুজরাট মধ্যপ্রদেশ বিহার হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের প্রায় তিন লক্ষ মানুষের কাছ থেকে তিনি ১৬০০ কোটি টাকা তুলেছেন। কিন্তু এইসব রাজ্যের মোট জনসংখ্যার একটা সামান্য অংশকেই মনোরঞ্জন রায়রা ঘায়েল করতে পারেন। প্রশাসনও এ ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য এর উল্টো ছবিটাই দেখা যায়। সারদা কাণ্ডের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, যারা প্রতারিত হয়েছেন তাদের টাকা সরকার ফিরিয়ে দেবে। কারা টাকা ফেরত পেয়েছেন কেউ জানে না। তবে স্বপন দত্ত-মিনতি বারুইরা পাননি। এবং মমতার রাজনৈতিক খয়রাতির (অবশ্যই মানুষকে বিপথগামী করার উদ্দেশে) সুযোগ নিয়ে তৃণমূলের মেজ-সেজ-ছোট অনেক নেতা বাড়ি-গাড়ি করে ফেলেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এত কাণ্ডের পরেও কি পশ্চিমবঙ্গে লোকঠকানো ব্যবসায় রাশ টানা গেছে? না, যায়নি। স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশে বেশ কিছু চিটফান্ড কোম্পানি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক একটি সরকারি রিপোর্টে সেই তথ্যই মিলেছে। সেই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, পশ্চিমবঙ্গ কি পনজি স্কিম এবং চিটফান্ডের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে?

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এখনও পর্যন্ত যে অভিযোগ জমা পড়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায়, সারাদেশে যত পনজি স্কিম, মালটি লেভেল মার্কেটিং স্কিম এবং সন্দেহজনক আর্থিক প্রকল্প চলে তার ৭৩ শতাংশই পশ্চিমবঙ্গের। কেন্দ্রের সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস (এসএফআইও) এবং করপোরেট ফ্রড ইনভেস্টিগেশন উইং এরকম ১৮৫টি কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে এই তথ্য জানতে পেরেছে। ১৮৫টি কোম্পানির ১৩৫টি এই পশ্চিমবঙ্গের। এসএফআইও এবং কেন্দ্রীয় সরকারি তথ্য বলছে, বছরে গড়ে ২৫ শতাংশ সুদের লোভ দেখিয়ে এইসব কোম্পানির এজেন্টরা মানুষকে পথে বসাচ্ছে।

সরকারি পরিসংখ্যানে একবার চোখ বোলালে মাথা ঘুরে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে সারা দেশের ৬৩টি পনজি কেসের ৫৮টি (৯২ শতাংশ) ছিল পশ্চিমবঙ্গের। ২০১৫-১৬ সালে ৪৭টির মধ্যে ২৬টি (৫৬ শতাংশ)। চলতি আর্থিক বর্ষে সারাদেশে এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত ২৪টি কেসের মধ্যে ১৯টি পশ্চিমবঙ্গের অবদান।

পনজি স্কিমের পাশাপাশি আর একটি রাতারাতি বড়লোক হবার স্কিম হলো মালটি লেভেল মার্কেটিং। আজকাল ইন্টারনেটে কম পুঁজিতে বা একেবারে পুঁজি ছাড়াই নানারকম ব্যবসার কথা জানতে পারা যায়। এইসব ব্যবসার মোদ্দা কথা হলো, নিজে করো এবং অন্য লোককে বুঝিয়ে তাকে লাইনে নামাও। তাহলে তার ব্যবসার একটা মোটা লভ্যাংশ তোমার পকেটে ঢুকবে। এইভাবে তুমি

রাতারাতি বড়লোক হবে। কত বাঙালি ছেলে যে এর খপ্পরে পড়ে হয়রান হয়েছে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। হাওড়ার শুভাশিস দত্তর কথাই ধরা যাক। তাকে বলা হয়েছিল দশ জনকে ব্যবসায় নামাতে পারলে তার মাসিক রোজগার হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। বেকার শুভাশিস বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু দশজনকে নামানোর পর তাকে বলা হলো, প্রত্যেক মাসেই টিমের কেউ না কেউ কোম্পানির টার্গেট পূরণে ব্যর্থ। তাই অত টাকা দেওয়া যাবে না।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে মাল্টি লেবেল মার্কেটিং থেকে কেউ কখনও লাভ করেনি। রাজনীতির ধামাধরা লোকেরা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সবসময়েই এইসব স্কিম থেকে লাভবান হন। তার প্রধান কারণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি গত চল্লিশ বছর ধরে প্রতারণা-নির্ভর। রাজনীতিকরাও অপরাধপ্রবণ। বস্তুত বামফ্রন্ট আমলেই পশ্চিমবঙ্গের সমাজব্যবস্থাকে ঘোলাটে রাজনীতির মাধ্যমে অপরাধপ্রবণ করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। সেই চেষ্টা আকাশচুম্বী সাফল্য পেয়েছে তৃণমূল আমলে। এখন একটি সাধারণ পরিবারের বাঙালি ছেলে বেসরকারি বিমা কোম্পানির এজেন্ট হয়ে অনায়াসে বলে দেয়, তাদের কোম্পানির ইউলিপ (ইউনিট লিঙ্কড ইনসিওরেন্স পলিসি) কিনলে দু' বছরে টাকা ডবল হয়ে যাবে। অথচ ইকুয়িটি-নির্ভর বিমায় যে ঝুঁকি থাকে সেকথা ভুলেও জানায় না।

সমস্যা হলো, চীন বা সিঙ্গাপুরে যেমন মালটি লেবেল মার্কেটিং এবং পিরামিড সেলিং সিস্টেম বন্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট আইন রয়েছে, ভারতে সেরকম কোনও কেন্দ্রীয় আইন নেই। ভরসা শুধু চব্বিশটি রাজ্যে পাশ হওয়া বিশেষ আইন।

সম্প্রতি কেন্দ্র রাজ্য-পর্যায়ের একটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেছে, যা রেগুলেটর এবং তদন্ত এজেন্সিগুলির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী আদানপ্রদানে একটি জয়েন্ট ফোরামের কাজ করবে। অবৈধ লেনদেন বন্ধে কেন্দ্রের এই উদ্যোগ অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। আর বি আই জানিয়েছে, কমিটির কাছে এখনও পর্যন্ত যে ৪৮৬টি কেস নথিভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে ১১৬টি (২৩ শতাংশ) পশ্চিমবঙ্গের।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্র আরও একটি আশার কথা শুনিয়েছে। ব্যানিং অব আনরেগুলেটেড ডিপোজিট স্কিমস অ্যান্ড প্রোটেকশন অব ডিপোজিটারস ইন্টারেস্ট বিলের খসড়া ইতিমধ্যেই কেন্দ্র তৈরি করেছে। আপাতত তা রাজ্যগুলির মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই বিল আইনে পরিণত হলে পনজি স্কিম নিয়ন্ত্রণ আরও সহজসাধ্য হবে। মালটি স্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট, ২০০২ নামক আইনটির নানা ফাঁকা ফোকর কাজে লাগিয়ে বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থাগুলি এতদিন সাধারণ মানুষকে পথে বসিয়েছে। মোদী সরকারের প্রস্তাবিত আইনে অপরাধীদের শাস্তির বিষয়টি (কমপক্ষে দশ বছর জেল ও জরিমানা) তো থাকছেই, সেই সঙ্গে লগ্নিকারীদের টাকা ফেরত দেবার জন্য সংস্থার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার পথও খোলা থাকছে।

তবে মিনতি বারুইদের হয়রানি শুধুমাত্র আইন করে বন্ধ করা যাবে না। সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনস্তত্ত্ববিদ চন্দ্রিমা হালদার বলেন, 'ভোগবাদী ব্যবস্থায় অনেক মানুষই এখন ইজি মানির প্রতি আকৃষ্ট হন। তাদের এই লোভকেই কাজে লাগায় পনজি স্কিমগুলো। লোভ সংবরণ করতে না পারলে বারবার ঠকতে হবে। মানুষকে বুঝতে হবে ইজি মানি বলে কিছু হয় না।'

চন্দ্রিমাদেবীর পরামর্শ অবশ্য স্বপন দত্তরা বুঝবেন। তাদের ক্ষেত্রে ইজি মানির হাতছানি একটা বড়ো কারণ। কিন্তু মিনতি বারুইরা? কিংবা ১০ টাকা প্রতি পৃষ্ঠা দরে প্রুফ দেখা কলেজস্ট্রিটের হতভাগ্য প্রুফ রিডার? এদের পক্ষে কি পনজি স্কিমের হাতছানি এড়ানো সম্ভব? পশ্চিমবঙ্গে খুব কম শ্রমিক বা পেশাদার কর্মীকে পাওয়া যাবে যারা তাঁদের মেধা, দক্ষতা এবং পরিশ্রম অনুযায়ী রোজগার করতে পারেন। উপার্জন যদি বাজার অনুযায়ী না হয় তাহলে ইজি মানির প্রতি আকর্ষণ বাড়তে বাধ্য। বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে একজন শ্রমিকের গড় উপার্জনে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। সেটাও কিন্তু এ রাজ্যে চিটফান্ডের রমরমার অন্যতম প্রধান কারণ। ■

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

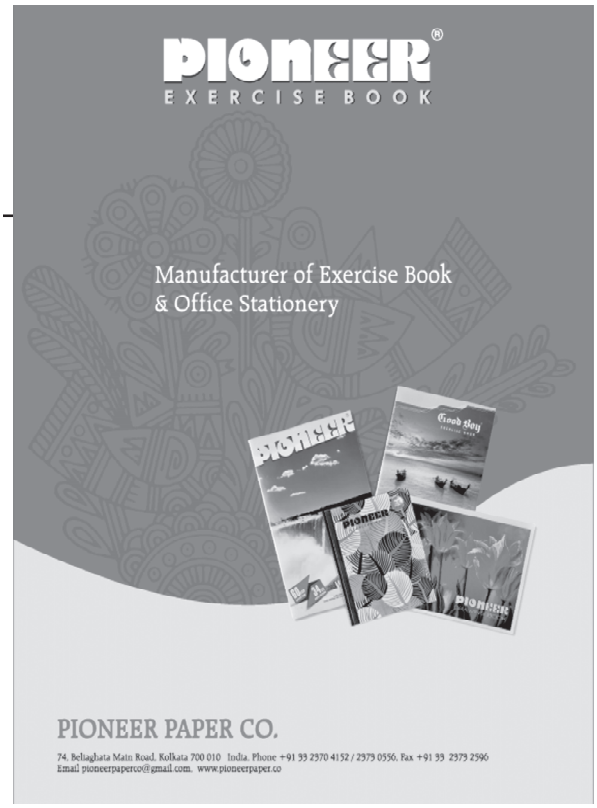

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

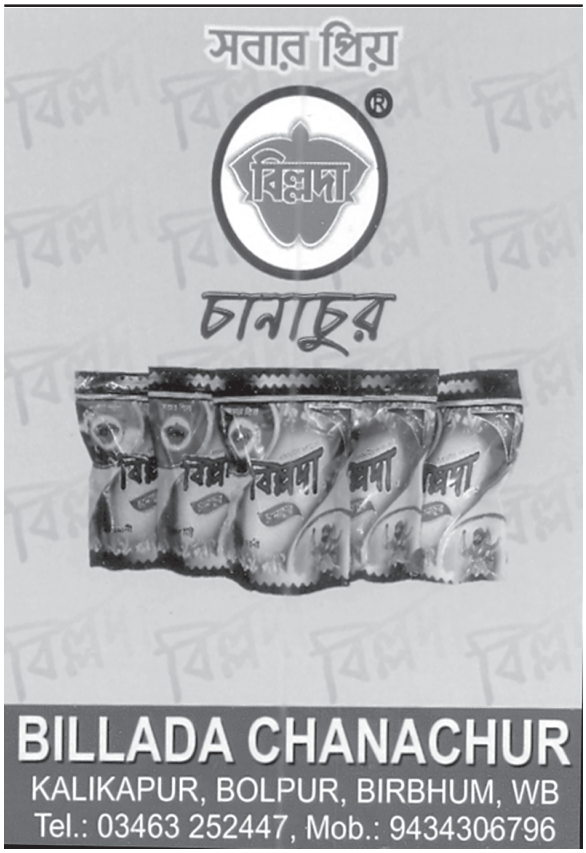

স্থানীয় ক্লাবের অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখছেন মনোজ উপাধ্যায়।

মনোজ কিন্তু রোদ্দুর হতে পেরেছিল...

শিলাদিত্য

ট্রেন ছুটছে। মুম্বই এক্সপ্রেস ভায়া নাগপুর। আপার বার্থে শুয়ে আছে মনোজ। মনোজ উপাধ্যায়। ভদ্রেশ্বরের স্বয়ংসেবক। দুপুরে খাবার কিনতে হবে বলে ডাকতেই বলল, 'নেহি চাহিয়ে, লিট্টি হ্যায়।' কস্মিনকালেও দুপুরে লিট্টি খাব ভাবিনি। ব্রেকফাস্টেও নয়। মনোজ বলল, তাই খেয়ে নিলাম একটা, দুটো, তিনটে। প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে দেখি, অনেক অনেক লিট্টি। মনোজের মা বানিয়ে দিয়েছেন। রাহা খরচ লাগবে না। শুধু মনোজ নয়, আমিও কলকাতা থেকে নাগপুর শুধু লিট্টি খেয়েই কাটিয়ে দিলাম। আজও যেন সেই স্বাদ লেগে রয়েছে জিভে। আজও মনোজের কথা ভাবলেই প্রথম ঘনিষ্ঠতার লিট্টির কথা মনে পড়ে। ভদ্রেশ্বর পুরসভার প্রয়াত চেয়ারম্যান নয়, মনে পড়ে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকেই 'গণবেশ'-এ বেরিয়ে পড়া ছেলেটার কথা।

যাকে দেখে আমরা অনেকে, আমি তো বটেই অনেক কিছু অনুকরণ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। চেষ্টাটুকুই হয়েছে। আসলে রোদ্দুরকে অনুকরণ বা অনুসরণ করা যায় না। রোদে তৈরি হওয়া ছায়ার পিছু নেওয়া যায়। কিন্তু হায় রে বিধাতা, একদিন কালো ছায়াই গিলে নিল আস্ত রোদ্দুরটাকে!

গোপালজীর ভাই মনোজকে চিনতাম, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার শুরু সেই মুম্বই এক্সপ্রেসে। তাও প্রায় বছর কুড়ি আগে। না, মুম্বই এক্সপ্রেস চড়ার আগে সকাল থেকেই জেলা প্রচারক মধুময় নাথের নির্দেশে রিষড়ায় সমাবেশ। গোটাদিন এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের গুরুত্ব অনুধাবনের ক্লাস চলেছিল। দুপুরে এক সঙ্গে খেয়ে, ঘুমিয়ে ট্রেন। প্রথমবার বাড়ির কাউকে ছাড়া দূরপাল্লার ট্রেন। এক মাসের জন্য বাড়ি ছাড়ার পিছুটান, ছোট থেকে গল্প শোনা নাগপুরের আকর্ষণ দুই-ই ছিল মনে। কিন্তু সেসব চাপা পড়ে গেল। বয়সে অনেক ছোট মনোজ কী করে যেন নেতৃত্ব নিয়ে নিল। চলতে লাগল গান আর গান। মন-খারাপ পালানোর পথ পেল না। আমার মতো হুগলি জেলার বাকিদেরও।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে তাঁরা জানবেন যে, সেখানে কীভাবে সম্পর্কের বৃত্ত বড় হতে থাকে। জেলা থেকে বিভাগ, প্রদেশ হয়ে দেশে মিলে যেতে হয়। তারপরে আবার 'গণ' কিংবা 'গট' হিসেব গড়ে ওঠে যাপন। দেখা করার জায়গা— স্মৃতিমন্দির। দুপুরে ও রাতে ভোজনের

এই জায়গাতেই খুন হন মনোজ উপাধ্যায়।

মনোজ উপাধ্যায় খুনের দায়ে ধৃতরা।

পরে।

কী শারীরিক, কী বৌদ্ধিক সবেতেই মনোজের সমান আগ্রহ। আর দেখা হলেই এক আলোচনা, নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে কীভাবে শাখার সংখ্যা বাড়ানো যায়। অন্য কোনও কথা নেই। এমন 'রত্ন' পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সংগঠন শব্দটাই যাঁর একমাত্র সম্বল। সত্যই রত্ন হারাল তৃণমূল কংগ্রেস। আগলে রাখতে পারল না ভদ্রেশ্বর। মনোজের প্রিয় ভদ্রেশ্বর কি 'রক্ত ঋণ' শোধ করতে পারবে!

না, মনোজ উপাধ্যায় তৃণমূলনেতা হতে চায়নি, মনোজ পুরসভার চেয়ারম্যান হওয়ার স্বপ্ন দেখেনি। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে অনুকরণ করে বলা যায়— ও রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। কবির অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি। মনোজ কিন্তু রোদ্দুর হতে পেরেছিল। শহিদ মনোজ রোদ্দুর হতে পেরেছিল।

মনোজ সারা জীবন সঙ্ঘের জন্য কাজ করতে প্রচারক ব্রত নিতে পারত। ওর মনের গঠন, পারিবারিক পরিস্থিতি সবই অনুকূলে ছিল। কিন্তু মনোজ বড্ড ভালোবাসত নিজের শহর ভদ্রেশ্বরকে। নিয়তি সত্যই সেই ভালোবাসার মূল্য দিয়েছে। মনোজের রক্তে ভিজেছে ভদ্রেশ্বরের মাটি।

ওর শেষ যাত্রায় চোখের জলে ভেসেছে ওর নগরও! সেই চোখের জলের কোনও জাত, ধর্ম, রং ছিল না। সব একাকার করে দিয়েছে রোদ্দুর নিভে যাওয়ার আঁধার।

মনোজের শেষ যাত্রায় চোখের জলে ভেসেছে ওর নগরও! সেই চোখের জলের কোনও জাত, ধর্ম, রং ছিল না। সব একাকার করে দিয়েছে রোদ্দুর নিভে যাওয়ার আঁধার। অনেক দূর থেকে দেখেছি সেই হাজার হাজার মানুষের ভিড়কে। তাঁদের সবার অভিব্যক্তি এক— চলে গেল এক 'যুবক অভিভাবক'।

অনেক দূর থেকে দেখেছি সেই হাজার হাজার মানুষের ভিড়কে। তাঁদের সবার অভিব্যক্তি এক— চলে গেল এক 'যুবক অভিভাবক'। মনে মনে ভেবেছি, ওই ক্রন্দনরত জনতা বুঝতে পারল কি যে, সঙ্ঘ 'রাজধর্ম' পালনও শেখায়।

নাগপুরে এক মাস তৃতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণ শেষে ফেরার সময়ে আবার এক ট্রেন, এক বগি, পাশাপাশি বার্থ। আবার এক সঙ্গে ফেরা। তত দিনে আরও বেশি করে মনের দখল নিয়ে নিয়েছে। এটা ছিল ওর সহজাত গুণ। ওর এক কথায় বাড়ি না ফিরে চলে গেলাম তাঁতি বেড়িয়ায় চলা দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে। সেখানে দুটো দিন কাটিয়ে তার পরে বাড়ি, অফিস।

মনোজ বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে শুরু করল নিজের শহর ও পাশের শহরে সঙ্ঘ শক্তি বৃদ্ধির কাজ। এর পরে মহকুমার দায়িত্ব। নিরলস। সঙ্গী একটা সাইকেল। তার পরের কাহিনি সবার জানা। রাজনীতির ফাঁস পড়ল ওর গলায়। টেনে নিয়ে গেল জেলে। মুক্তির উপায় খুঁজতে ধরতে হলো রাজনীতির অন্য হাত। কিন্তু আদ্যপ্রান্ত এক স্বয়ংসেবকের মন থেকে মুছে গেল না শাখার মাঠে শেখা ছোট ছোট শিক্ষাগুলো। ওর রাজনৈতিক জীবনে অনেক বার মুখোমুখি হয়েছি, কথা বলেছি, কাজ দেখেছি, আর বুঝেছি ওর হৃদয়ে সঙ্ঘ আর মস্তিষ্কে উন্নয়ন। সেটা কোন ছাতার তলায় থেকে তা নিয়েও বড় বেশি ভাবেনি। আর ওর সুঠাম শরীরটা সংগঠন গড়ার জন্য সদা বলিপ্রদত্ত।

শাখার মাঠে দেশের জন্য, মানুষের জন্য বলিপ্রদত্ত হওয়ার শপথ নেওয়াটা মিথ্যা হলো না। আমি নিয়তিতে বিশ্বাস করি। তাই মনোজের খুনিদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নিয়তি যেমন মনোজের জীবনকে অন্য স্রোতে নিয়ে গিয়েছিল তেমন করে নিয়তিই হয়তো ওর অপঘাতে মৃত্যু ঠিক করে রেখেছিল। ওর মৃত্যু হতে পারত কোনও পথ-দুর্ঘটনায়। কিন্তু মনোজদের জন্য ওটা মানায় না। বুক পেতে গুলি খাওয়ার সম্মান যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ।

রোদ্দুরকে যে শুধু কালো মেঘই ঢেকে দিতে পারে। ■

মনোজ উপাধ্যায়

এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক চরিত্র

দেবাশিস আইয়ার

মনোজ উপাধ্যায় আজ বাংলার রাজনীতিতে একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্তও রাজ্য কোন ছার জেলারও বেশিরভাগ লোক জানত না সদ্যপ্রয়াত ভদ্রেশ্বরের এই পুরপ্রধানকে। আজ ফিরহাদ হাকিম থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় এই নেতা এক সময় যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সক্রিয় স্বয়ংসেবক ছিলেন সেই ব্যাপারটিই অনেক রাজনৈতিক বোদ্ধার হজম হচ্ছে না। একদল তৃণমূলি এই অজুহাতে তাঁর খুনের কেসটাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর সিপিএমের লোকেরা এই সুযোগে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে অভ্যন্তরীণ গোল পাকিয়ে মনোজ উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের পুরোন ঝাল মেটাতে চাইছে। আর তার জেরে রীতিমত ফাঁপড়ে পড়েছে উপাধ্যায় পরিবার। চার ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন মনোজ। বাকি তিন ভাইয়ের একজন আজও দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবক। কিন্তু বাকি দুই ভাই কোনোওরকম রাজনীতির সংস্পর্শে নেই। ভদ্রেশ্বর গেট এলাকার বরাবরের ডাকাবুকো সদাহাস্য মনোজ। সমাজের কাজ করার নেশা ছিল ছোট থেকেই। তার জন্য পণ করেছিলেন কোনওদিন বিয়ে করবেন না। যাতে কেউ না বলতে পারে নিজের পরিবারের জন্য দুর্নীতি করছেন। আর সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোশহীন সংগ্রামেই প্রাণ গেল মনোজ উপাধ্যায়ের। সেই আদর্শ থেকেই প্রথমে রাষ্ট্রীয় স্বযংসেবক সঙ্ঘে যোগদান, পরে এলাকার উন্নয়নের জন্য রাজনীতিতে প্রবেশ। এবং অচিরেই হয়ে পড়েন তৃণমূল নেকৃত্বের প্রিয়পাত্র।

ভদ্রেশ্বরের চন্দ্রশেখর সায়ং শাখার গটনায়ক থেকে সঙ্ঘের ভদ্রেশ্বর নগরের নগর কার্যবাহ হয়ে ওঠার জার্নিটি নেহাতই সাদামাটা ডেডিকেশনের অধ্যায় কিন্তু ১৯৯৮ সালে সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষা গ্রহণ করার পর থেকে তার বর্ণময় সোশ্যিওপলিটিকাল জীবনের শুরু। ২০০০ সাল থেকে ভদ্রেশ্বরের এক হিন্দু নেতা হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। তেলেনিপাড়ার রামনবমীর শোভাযাত্রা থেকে ৮ দিন ধরে বিশাল অষ্টযাম যজ্ঞের আয়োজন। সবই ছিল তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত। হিন্দু ইউনিটি তৈরির লক্ষ্যে। এই সময় মনোজদার নেতৃত্বেই তৈরি হয় 'জয় ভারত সংঘ'। উদ্দেশ্য স্থানীয় যুবকদের গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত রাখা এবং হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা তৈরি করা।

২০০২ সালে গোধরা কাণ্ডের পর তেলেনিপাড়ার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় মনোজদার হিন্দুদের রক্ষাকর্তা হিসাবে এগিয়ে আসা আজও সেখানকার লোকেদের মুখে মুখে ফেরে। আর তখনই লোকাল সিপিএমের চক্ষুশূল হয়ে পড়েন তিনি। তৃণমূল-বিজেপি জোটের আগামী নেতা হিসেবে তারা ভয় পেতে শুরু করে মনোজদাকে। সিপিএম কালচার অনুযায়ী মনোজদাকে হঠানোর জন্য পরিকল্পনা শুরু করে দেয় তারা। এলাকার খবর, তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান অবনী গাঙ্গুলীর অঙ্গুলিহেলনে একদল সিপিএম আশ্রিত সমাজবিরোধী মনোজদাকে প্রাণে মারার জন্য সেই সময় 'জয় ভারত সংঘ'-এ হামলা চালায়। আর সেই হামলা-পরবর্তী সময়ে সিপিএম কর্মী মহেশ সাউয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মনোজকে ফাঁসাতে উঠে পড়ে লাগে সিপিএম। একের পর এক মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয় মনোজদাকে। ফলে মনোজদারও দরকার হয়ে পড়ে পলিটিকাল সাপোর্টের। সেই সময় তৃণমূল-বিজেপি সখ্যের সুবাদে সরাসরি পলিটিকালি অ্যাক্টিভ হয়ে পড়েন মনোজদা। তার জেরে মনোজদাকে ফাঁসাতে আরও কোমর বেঁধে নামেন সিপিএমের নেতারা। এরপর জেল খাটতে হয়েছে তাঁকে। ২০০৫-এর পুরসভা নির্বাচনে ভদ্রেশ্বরের তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান অবনী গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে। তৃণমূলের হয়ে জেল থেকেই লড়েন মনোজদা। হেরে যান মাত্র কিছু ভোটের ব্যবধানে।

ইতিমধ্যে তৃণমূল-বিজেপির বিচ্ছেদ হলেও মনোজদা অকৃতজ্ঞ হতে পারেননি। রয়ে যান তৃণমূলেই। জেলপর্বে তাকে যারা প্রবলভাবে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের হাত ছাড়তে চাননি তিনি। তাই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সরাসরি তৃণমূলের হয়ে প্রবলভাবে ফিল্ডওয়ার্ক শুরু করে দেন। সেইসময় থেকেই ২০১০-এর নির্বাচনে পোড় খাওয়া অবনী গাঙ্গুলীকে হারানোর পণ করে বসেন জেদি এই তরুণ স্বয়ংসেবক। যথারীতি ফলও পান। ২০১০-এ অবনী গাঙ্গুলীকেই হারান মনোজ

উপাধ্যায়। হয়ে যান তৃণমূল বোর্ডের উপ-পুরপ্রধান। চেয়ারম্যান হন দীপক চক্রবর্তী।

কিন্তু পাশা ঘুরে যায় ২০১৫-তে। সে বছর জনপ্রিয়তার জোরে জিতে চেয়ারম্যান হয়ে যান মনোজদা। জিতেও কব্জে পায় না দীপক চক্রবর্তী। আসলে সেই সময় পূর্বতন চেয়ারম্যানের নামে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ স্থানীয় লোকমুখে ঘুরছিল। তার জেরেই বাদ পড়েন দীপকবাবু। আর তার রাগ পড়ে মনোজদার ওপর। সেই থেকেই একটা ঠাণ্ডা লড়াই ছিল এই দুজনের। এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায় কীভাবে দীপক চক্রবর্তীর আত্মীয়ের একটি বেআইনি প্রোজেক্টকে মঞ্জুর করেননি মনোজদা। পাশাপাশি তার পুরোনো সঙ্গী রাজু চৌধুরীর বেআইনি কাজকেও প্রশ্রয় দিতেন না তিনি। আর তার জেরে অনেক সমাজবিরোধীরই চোখের বালি হয়ে পড়েন তিনি।

এর সঙ্গে পুরোনো বাম জমানার শত্রুরাও ছিল। যে সিপিএম ক্যাডার মহেশ সাউয়ের মৃত্যুতে অভিযুক্ত ছিলেন মনোজদা তারই ভাই রাজু সাউ এখন আবার ভদ্রেশ্বরের নির্দল কাউন্সিলার। ফলে মনোজদার হত্যার ঘটনায় কোনও সরল সমীকরণ ছিল না। সেজন্যই পুলিশ রীমিমতো ধাঁধায়।

নিজের দলের প্রতি, দলের নেতৃত্বের প্রতি ডেডিকেশনের কোনও খামতি ছিল না মনোজদার। তাই এবছর এপ্রিলে রামনবমীর শোভাযাত্রার পরবর্তী সময়ে তেলেনিপাড়ায় যে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হয় তাতে একদম নিরপেক্ষ প্রশাসকের ভূমিকায় দেখা যায় মনোজদাকে। ধরপাকড়ের সময় হিন্দু-মুসলমান কাউকেই রেয়াত করেননি। স্বয়ংসেবক থেকে বর্তমান চেয়ারম্যানের পরিচয়ই তার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তিনি বলতেন, সঙ্ঘ আমাকে সৎ হতে, আদর্শনিষ্ঠ হতে, সাহসী হতে শিখিয়েছে, সমাজের তথা দেশের কাজ করার প্রেরণা জুগিয়েছে। আমাকে কোনওদিন বলেনি যে তোমাকে বিজেপি করতে হবে। তাই আমি যে পার্টিই করি না কেন যদি সৎভাবে সমাজ ও দেশের উপকারের জন্য প্রাণপাত করতে পারি তাহলেই আমি মনে করব আমি সঙ্ঘ কাজই করছি। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান ভদ্রেশ্বরের মানুষ

সোহম মিত্র

রাত তখন এগারোটা। ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায় রোজকার মতো সেদিনও বাড়ি ফিরছিলেন। বাইকের পিছনের সিটে তিনি, সামনে চালক। জিটি রোড থেকে বাঁদিকে বাঁক নিলে একটা গলি পড়ে। সেই গলির মুখেই দাঁড়িয়েছিল সাত-আটজন সশস্ত্র দুষ্কৃতী। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী অবশ্য জানিয়েছেন পনেরো- ষোলো জন। বাইক গলিতে ঢোকামাত্র তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভীত বাইকচালক কী করবেন বুঝতে না পেরে নিকটবর্তী একটা ক্লাবে দৌড়ে যান। উদ্দেশ্য, ক্লাবের ছেলেদের অকুস্থলে নিয়ে এসে দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা করা। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পর ফিরে এসে তিনি দেখেন ছ'টি বুলেটের আঘাতে মনোজবাবু নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এখনও পর্যন্ত ন'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের মধ্যে ছ'জনকে বারাণসী থেকে এবং একজনকে বিহারের ঝাঁঝা থেকে। পুলিশের এই সক্রিয়তায় ভদ্রেশ্বরের সাধারণ মানুষ খুশি। তারা জানেন বঙ্গীয় প্রশাসনের ফাঁকফোকর দিয়ে খুনি- অপরাধীদের পার পেয়ে যাওয়া অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করবেন না। তারা অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান।

পুলিশ যথাসাধ্য করলেও কয়েকটি প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠেছে। মনোজ উপাধ্যায় হত্যাকাণ্ডে যারা অভিযুক্ত তারা সকলেই স্থানীয় দুষ্কৃতী। ছোটখাটো চুরি ডাকাতি তোলাবাজি এবং সাধারণ চমকানো- ধমকানো পর্যন্ত তাদের এলেম। পুলিশের একাংশের মতে এদের পক্ষে ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যানকে খুন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এদের পিছনে এক বা একাধিক বড়ো মাথা আছে। পুলিশ আপাতত সেই মাস্টারমাইন্ডের তল্লাশিতে ব্যস্ত। পরের প্রশ্ন কেন খুন করা হলো মনোজকে? বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলার পর দুটি সম্ভাবনা উঠে এসেছে।

মোডাস অপারেন্ডি-১

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দ অর্থ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের মাধ্যমে খরচ হয়। ভদ্রেশ্বরেও তাই হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভদ্রেশ্বর প্রধানত জুটমিল এলাকা। এখানে যারা কাজ করেন তাঁরা বেশিরভাগই হিন্দিভাষী, তেলেঙ্গানা থেকে আসা কিছু শ্রমিকও আছেন। সাধারণত এরা চাকরি করতে আসেন, অবসরের পর আবার যে-যার ফিরে যান। কিন্তু কেউ কেউ তা না করে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। এরা লেখাপড়া বিশেষ জানেন না। পুলিশের অভিযোগ, এরাই কালক্রমে অপরাধী হয়ে ওঠে। এতকাল ভদ্রেশ্বর পুরসভার কাউন্সিলররা উন্নয়নের টাকায় নামমাত্র কাজ করে, বরাদ্দের একটা বড়ো অংশ আত্মসাৎ করতেন। স্থানীয় দুষ্কৃতী হবার সুবাদে সেই টাকার বখরা এরাও পেত। মনোজ উপাধ্যায় চেয়ারম্যান হয়ে আসার পর এসব বন্ধ করে দেন। পুরসভার প্রতিটি বিভাগের প্রাথমিক দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে কাজকর্ম পরিচালনা করার ফলে সরকারি অর্থের অপচয় একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। মনোজ উপাধ্যায়ের সদর্থক প্রয়াসের সুফল পেতে শুরু করেছিল ভদ্রেশ্বর। জিটি রোডের আশেপাশে চোখ বোলালেই সেটা টের পাওয়া যাবে। স্বাভাবিক

ভাবেই নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল এক শ্রেণীর কাউন্সিলর এবং স্থানীয় দুষ্কৃতীদের যোগসাজশে গড়ে ওঠা মাফিয়াচক্রের। পুলিশের অভিযোগ, চেয়ারম্যানের হত্যাকাণ্ডে এদের হাত থাকতে পারে।

মোডাস অপারেন্ডি-২

ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়া মুসলমান-প্রধান অঞ্চল। প্রায়ই সেখানকার মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর চড়াও হয়। এখনও পর্যন্ত কারোও মৃত্যু না হলেও হিন্দুদের দোকানপাট লুঠ হয়, বাড়িঘর ভাঙে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হিন্দুদের টাকাপয়সা, দোকানের মালপত্র চুরি করার উদ্দেশ্যেই মুসলমানরা ধর্মীয় জিগির তুলে অত্যাচার করে। মনোজ উপাধ্যায় চেয়ারম্যান হবার পর থেকে তেলেনিপাড়ায় কোনও লুঠপাট হয়নি। ফলে লুটের মালের বখরা যেসব স্থানীয় তৃণমূল নেতা পেতেন তারাও পরিকল্পনা করে মনোজ উপাধ্যায়কে খুন করাতে পারেন বলে মনে করছেন কেউ কেউ।

ভদ্রেশ্বরের মানুষের আর একটি আশঙ্কা সে-রাতে যিনি বাইক চালাচ্ছিলেন তাকে ঘিরে। কারণ তিনিই হত্যাকাণ্ডের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। অপরাধীদের শাস্তি দিতে হলে তাকে প্রয়োজন। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের যারা মাস্টারমাইন্ড তারা কি তাকে বাঁচতে দেবেন? আইনগত বাধায় পুলিশও তাকে নিজেদের হেফাজতে রাখতে পারবে না। যদিও পুলিশ ইতিমধ্যেই তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু প্রচণ্ড আতঙ্কে তিনি ট্রমায় আক্রান্ত। বাড়ির বাইরে যেতে পারছেন না। এই অবস্থায় পুলিশ ও প্রশাসনকে চাপে রাখতে ভদ্রেশ্বরের মানুষ শোকমিছিল করেছেন। সব দলের কর্মী-সমর্থকদের সেই মিছিলে দেখা গেছে। কিন্তু কোথাও কোনও দলীয় পতাকা দেখা যায়নি। স্বজনবিয়োগ হলে যেমনটি হওয়া উচিত, সেভাবেই মনোজকে বিদায় জানিয়েছে ভদ্রেশ্বর। ■

এই সময়

বরাহকাণ্ড

শুয়োরের সঙ্গে লেখাপড়ার সম্পর্ক খুব মধুর নয়। সম্ভবত তারই প্রমাণ দিতে টোকিওর

একটি স্কুলে জংলি শুয়োররা হামলা চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, স্কুলের সুইমিং পুলে স্নান সেরে নিতেও ভোলেনি শুয়োরেরা। ভরদুপুরে শুয়োর দেখে ছাত্ররা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যদিও ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়নি।

পাইথন

জাতে বার্মিজ। লম্বায় ১৭ ফুট। ওজন ১৩০ পাউন্ড। মায়ামি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে

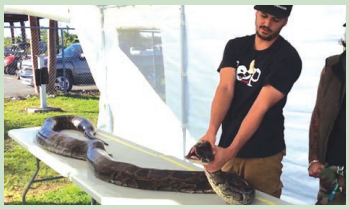

এরকমই এক দৈত্যাকার পাইথন শিকার করেছেন জেসন লিয়োন। জলে ডোবা অবস্থায় পাইথনটিকে দেখার পর তিনি তার মাথায় গুলি করেন। এত বড়ো পাইথন এর আগে এই অঞ্চলে দেখা যায়নি।

ট্রাকের নীচে

ভাবা যায়! ট্রাকের সামনের বাঁদিকের চাকার খুব কাছে বাইক সমেত আটকে রয়েছেন এক

মহিলা এবং ট্রাক তাকে কয়েক মিটার টেনে নিয়ে যাচ্ছে! এরপরও বেঁচে গেছেন মহিলা। ট্রাক থামার পর ড্রাইভারের সঙ্গে ঝগড়াও করেছেন। ঘটনাটা চীনের।

সমাবেশ -সমাচার

সংস্কার ভারতী বাগুইআটি শাখার বার্ষিক অনুষ্ঠান

সংস্কার ভারতীর বাগুইআটি শাখার বার্ষিক অনুষ্ঠান গত ৩ ডিসেম্বর বাগুইআটি ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভাবসঙ্গীত 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী' পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। গুরু বিশ্বাস, শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, ভরত কুণ্ডু, গোপাল কুণ্ডু, সুকুমার সেন, সুভাষ ভট্টাচার্য এবং স্থানীয়

শাখার আদিত্যজোতি রায়, শ্যামল রায়, কনক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অধিকারী নটরাজের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাগুইআটি শাখার সম্পাদিকা সুজাতা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে লোকগীতি পরিবেশিত হয়। পরিচালনায় ছিলেন দেবাশিস সিনহা। সংগঠনের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন গুরু বিশ্বাস ও শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। স্কুলের ভাইসপ্রিন্সিপাল শ্রীমতী সুদেষ্ণা চৌধুরী সংস্কার ভারতীর কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে শাখার নাট্য প্রমুখ সমর অধিকারীর রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে একক কথকতা 'হে জাহ্নবী' পরিবেশিত হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাগুইআটি শাখার সংগঠন সম্পাদিকা শ্রীমতী অঞ্জনা মল্লিক। রাষ্ট্র বন্দনার পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়।

বসিরহাটে দম্পতি সম্মেলন

গত ২ ডিসেম্বর কুটুম্ব প্রবোধনের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট শিশু মন্দিরে এক সুন্দর পরিবেশে দম্পতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক অমর ভদ্র। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। প্রধান অতিথিরূপে আসন অলংকৃত করেন স্বস্তিকার ব্যবস্থাপক জয়রাম মণ্ডল।

শিলিগুড়ি বিভাগের বজরঙ্গ প্রশিক্ষণ বর্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুবশাখা বজরঙ্গ দলের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ বর্গ ২৫-২৬ নভেম্বর শিলিগুড়ির নিকটে শালবাড়ি বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ি,

এই সময়

চোর ও ভিখারি

আমেরিকার সান্টা আনার ইজরায়েল পেরেজ র‍্যাঙ্গেল পেশায় চোর। সম্প্রতি সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। সে

একটি ফেরারি গাড়ি চুরি করে। দাম দু' কোটি টাকা। চুরির সময় সে ধরা পড়েনি। কিন্তু পেট্রোলপাম্পে তেল ভরার সময় ধরা পড়ে যায়। কারণ তার কাছে কোনও টাকা ছিল না।

বিরাট, দ্বিতীয়

টেস্ট ক্রিকেটের সফল ব্যাটসম্যানদের তালিকায় ভারতের অধিনায়ক দু' নম্বরে উঠে এলেন। সদ্য শেষ হওয়া ভারত-শ্রীলঙ্কা

সিরিজে বিরাট ৬১০ রান করেছেন। উল্লেখ্য, একদিনের আন্তর্জাতিক এবং টি-২০-তে বিরাট কোহলি এক নম্বরে রয়েছেন।

রমণ সিংহ, ১৪

ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি এক বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ১৪ বছর একটানা শাসনভার সামলে তিনি রেকর্ড করলেন। প্রশাসক জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি

যাবতীয় কৃতিত্ব রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষকে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন ২০০৩ সালের ৭ ডিসেম্বর।

সমাবেশ -সমাচার

জলপাইগুড়ি ও ঈশ্বরপুর জেলা নিয়ে শিলিগুড়ি বিভাগের এই বর্গে ৪৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষক, প্রবন্ধক নিয়ে মোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। বর্গের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক গৌতম সরকার এবং প্রান্ত বজরঙ্গ প্রমুখ রতন তরফদার। বর্গে দণ্ড, নিযুদ্ধ ও আসন শেখানো হয়। বর্গে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সম্পাদক উদয়শঙ্কর সরকার, প্রান্ত সহ-সভাপতি ধীরেন সরকার, মঙ্গলময় মুখার্জী, কমলা রায়, নয়ন আইচ, রাকেশ আগরওয়াল প্রমুখ।

রাজ্যে শৌর্যদিবস পালিত হলো

শাসকদল ও প্রশাসনের রক্তচুক্ষুকে উপেক্ষা করে গত ৬ ডিসেম্বর দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় কোথাও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে, কোথাও বজরঙ্গ

দলের যোজনায় কোথাও স্থানীয় নাগরিকরা শৌর্যদিবস হিসেবে পালন করেন। পুলিশ বিভিন্ন জেলায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

বঙ্গীয় ল-ক্লার্ক পরিষদের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন

গত ২৫ নভেম্বর কলকাতার বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিটের ভারতসভা হলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় ল-ক্লার্ক পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন। এই ল-ক্লার্ক সংগঠন মূলত আদালতের সহযোগী কর্মীবৃন্দের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা রাজ্যব্যাপী একটি সংগঠন, যা রাষ্ট্রবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ও নিয়োজিত।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক ও সংগঠনের অন্যতম স্থপতি কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় কুমার নন্দী। এছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী সমীর পাল, বিশিষ্ট বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অমিতাভ গাঙ্গুলী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ড. সুনন্দ মণ্ডল, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসার অশোক রায়, ল-ক্লার্ক

এই সময়

হিন্দু সংখ্যালঘু

ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিজ তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। উদ্দেশ্য,

জম্মু-কাশ্মীর ও পঞ্জাব-সহ আটটি রাজ্যে সরেজমিনে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে বসবাসকারী হিন্দুদের সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করা। এইসব রাজ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ৫০ শতাংশের কম।

সন্ত্রাসে শাস্তি

রাজস্থানের একটি আদালত আটজন সন্ত্রাসবাদীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত

করেছে। এদের মধ্যে তিনজন পাকিস্তানের লস্কর-ই- তৈবার সঙ্গে যুক্ত। স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর মহাবীর জিন্দাল জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে শাস্তি পেয়েছে।

বিয়র থেকে পেট্রোল

অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে বিয়র ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে পেট্রোল উৎপাদনের প্রথম

ধাপটি পেরোলেন বিজ্ঞানীরা। সারা পৃথিবীতে পেট্রোলের বিকল্প হিসেবে বায়ো-ইথানল ব্যবহার করা হয়। নতুন এই পেট্রোলের উৎপাদন শুরু হলে বায়ো-ইথানল অনেকটাই পিছনে সরে যাবে।

সমাবেশ -সমাচার

কাউনসিলের প্রাক্তন সম্পাদক জীবন সেন, নিরোদ মাইতি, বিপ্লব সরকার, সঞ্জীব কুমার কুণ্ডু, সহদেব খাসকেল, সুভাষ সূত্রধর, সুভাষ চন্দ্র দে, হেমন্ত মণ্ডল প্রমুখ।

সংগঠনের সভাপতি মনোজ কুমার দুবের অক্লান্ত শ্রম, নিষ্ঠায় সম্মেলনটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অজয় নন্দী ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ তাঁদের বক্তব্যে বর্তমানে রাজ্য প্রশাসনিক স্তরের অরাজকতা ও অহেতুক প্রশাসনিক হেনস্থার বিরুদ্ধে সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যকে সজাগ থাকা এবং প্রশাসনিক হেনস্থার শিকার যেসব মানুষ তাদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, খুব তাড়াতাড়ি থানা প্রশাসন ও আদালতে সাধারণ মানুষের পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে ওঠুক এই সংগঠন।

বঙ্গীয় ল-ক্লার্ক পরিষদের সদস্যগণ যেহেতু আদালত ও থানা সংক্রান্ত কাজে যুক্ত সেহেতু একটি সুস্থ যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রশাসনিক অরাজকতা বা বিশেষ কোনো অযাচিত ঘটনার বার্তাকে ছড়িয়ে দিয়ে জনজাগরণের মাধ্যমে সুদৃঢ় ভাবে ইতিবাচক জনমত গঠনের কথা তাঁদের বক্তব্যে প্রকাশ করেন।

রাজ্যের ২৭টি আদালত থেকে আগত বহু ল-ক্লার্ক বন্ধুর উপস্থিতিতে সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

বীরভূম বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক কলেজের উদ্যোগে স্বাস্থ্যসচেতনতা শিবির

গত ২২ নভেম্বর বীরভূম হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতালের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্যসচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে অল ইন্ডিয়া হোমিওপ্যাথিক

অ্যান্ড ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের হোমিও ভিশন শাখা কুনডলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অনাথ আশ্রমের ছাত্র- ছাত্রীদের পুস্তক, খাতা-কলম প্রদান করা হয়। শিবিরে ডাঃ কিংশুক গোস্বামী ও কলেজের অধ্যাপক ডাঃ অভিনন্দন ব্যানার্জীর পরিচালনায় পথনাটিকার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ, স্বচ্ছ ভারত অভিযান পরিবেশিত হয়। শেষে কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিশুরোগ ও ডেঙ্গু বিষয়ে দেখানো হয়। শিবির উদ্বোধন করেন বীরভূম বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ তপন কুমার চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন বহু অধ্যাপক ও চিকিৎসক।

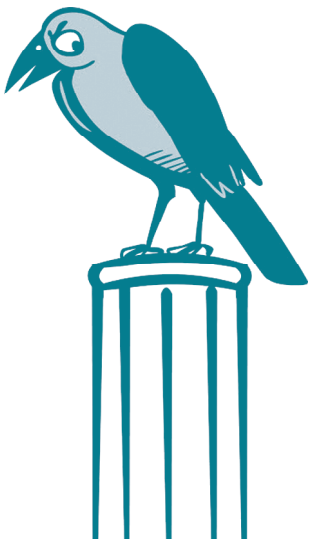

‘গোড় লাগি বরমদেওজি’

পরশুরামের ‘ভূশণ্ডীর মাঠে’ গল্পে উপবীতধারী ব্রাহ্মণসন্তান শিবু, গৃহিণী নেত্যকালীর ঝাঁটার স্পর্শে মন উচাটন হয়ে কালীঘাটে গিয়ে এবংবিধ ব্যবহারের জন্যে খাণ্ডারনি স্ত্রীর হাত থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিল। কী আশ্চর্য, উলটা বুঝলি রাম! ঠাকুরের কৃপায় বাড়ি ফিরে বিসুচিকা রোগে রাতেই শিবুর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটায় সে ব্রহ্মদৈত্যরূপে ভূশণ্ডীর মাঠে এক বেলগাছে আশ্রয় নিল। তাকে দেখে সেই গাছেরই আর এক ভূত কারিয়া পিরেত, ভক্তিভরে বলে উঠল, গোড় লাগি বরমদেওজি। ভূতের জগতেও বরমদেওজি ও পিরেতের মধ্যে বর্ণবিভাগ যে অত্যন্ত প্রবল তা সহজেই বোঝা যায়। যেমন উচ্চনীচ ভেদহীন বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধর্মেও বর্ণবিভাগের দাবিতে সংরক্ষণ সাম্যবাদী ভারতে অত্যন্ত প্রবলভাবে সোচ্চার।

সম্প্রতি আবার সেকুলার রাজনীতিতে উপবীতধারী বরমদেওজির আবির্ভাবে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে তিনি আবার শিবভক্ত। ভক্তির আবেশে উদ্দণ্ড নৃত্যে যে অনেকেরই কাছাখোলা অবস্থা হয় তা প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু ভক্তির আধিক্যে যে বুদ্ধির ভিমরতি ধরে তা সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে। সেই যিশুখ্রিস্টের কথায় বলতে হয়, হায় ঈশ্বর এরা কী করছে তা জানে না, ইহাদের ক্ষমা কর। বৈষ্ণবধর্মে ও শৈব আচারে যে জাতপাতের বিচার নেই, ব্রাহ্মণ প্রতিপত্তির কোনও প্রশ্ন নেই, সেকথার খেয়াল এই কংগ্রেসি ভক্তপ্রবরদের নেই। রাজাকে ইচ্ছেমতো সাজাতে গিয়ে বরকন্দাজরা একবার বলছে উপবীতধারী ব্রাহ্মণ, আবার অন্যদিকে বলছে শিউভক্ত। আসলে জাতের বিচারে বজ্জাতি করতে গিয়ে তারা যে বে-ইজ্জতি কাণ্ড কারখানা করছে তা আর চাপা দেওয়া যাচ্ছে না।

খাচ্ছিল তাঁতি সেকুলারিজম বুনে, কাল হলো তাঁতির ধর্মের ষাঁড় কিনে। আমরা আগে সেকুলার কেষ্টদের মুখে শুনেছি ধর্ম জনগণের আফিং এবং খুব ক্ষতিকর, সুতরাং ধর্মকে বাদ দিয়ে চলাই শ্রেয়। তবে ধর্মকে না মানলেও ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের থিসিস ঝেড়ে ধর্মের দাবিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে একত্ববাদী পাকিস্তান সমর্থন করা যায়। সেই একত্ববাদী পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরই বহুত্ববাদী ভারতের রক্ষায় সেকুলারিজম চর্চায় চারিদিকে মত্ত হয়ে ওঠে। ভারতে সেই বহুত্ববাদ রক্ষায় কিন্তু ভোটের ফিকিরে সেকুলার সতীত্বে অকারণে মোল্লাতোষণ ভোটের আগে ইমামদের দরগায় হত্যে দিতে ও পিরদের মাজারে সিরনি চড়াতে কোনও বাধা হয় না। এবং স্বাধীন ভারতে সত্তর বছর পার হওয়ার পরও প্রতিবার ভোটের আগে সেই সেকুলারিজম রক্ষাই একমাত্র জিগির হয়ে ওঠে।

কিন্তু হায়, জীবনের ধর্মে পুরনো প্যাঁচে কিছুদিন কাজ চলতে পারে কিন্তু চিরকাল চলে না। কেননা সাধারণ সত্য হলো, ধাপ্পা দিয়ে কিছুদিন কিছু লোককে বিভ্রান্ত করা গেলেও, চিরদিন সব লোককে কবজা করা যায় না। সেই জন্যেই বোধ হয় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কূটকৌশলের কিছু পরিবর্তন করতে হয় বৈকি। তাই মহান সেকুলার পার্টি অল ইন্ডিয়া কুব্জা কংগ্রেস (গান্ধী) প্রাইভেট লিমিটেড যখন দেখল সেকুলার কাঠের বেড়াল দিয়ে আর ভোটের ইঁদুর ধরা যাচ্ছে না, তখন একটু ধর্মের ধাস্টামো করলে ক্ষতি কী।

অপোগণ্ড নেতৃত্বকে দিয়ে যখন ভোট ভজানো যাচ্ছে না তখন তাকে একটু বেড়ালতপস্বীর মতো ফোঁটা কেটে মালা পরাতে দোষ কী। অতএব নতুন সাজে দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী, আসিল যত গর্দভবৃন্দ আসন তব ঘেরি। সেই গর্দভবুদ্ধির পরাকাষ্ঠায় নতুন সাজে ঠুঁটো জগন্নাথকে সাজাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যে আমও গেল, ছালাও গেল অবস্থা! আসলে গর্দভের জীবনের ট্র্যাজেডিই হলো, সে জানে না যে সে চরিত্রগতভাবে কত বড়ো গর্দভ। রাজাকে সূক্ষ্মবস্ত্রে সাজাতে গিয়ে রাজার যে কী অবস্থা হয় তা বালকেও বোঝে।

আসলে হিন্দুত্ববাদী শাস্ত্রে সেই করে বলা হয়েছে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ; কিন্তু সেকথা এদের বোঝায় কে! এই Dynastic Democracy-র উজ্জ্বল উদাহরণ কুব্জা কংগ্রেস (গান্ধী) প্রাইভেট লিমিটেডের আদি পুরুষ মহা ইনটেলেকচুয়াল, বাদশাহি সোশ্যালিস্ট, সেকুলার অ্যাগনস্টিক মহান নেহরু একজন স্বঘোষিত ‘হিন্দু বাই মিসটেক’। সুতরাং তাঁকে হিন্দুর সন্তান বললেও কিছুতেই হিন্দু বলা চলে না। পণ্ডিতের ছেলে যেমন মূর্খ হয়, তেমনি হিন্দুর ছেলে অহিন্দু হতে কোনও বাধা নেই। প্রথম দিকে কাশ্মীরি পণ্ডিত হিসেবে তাঁর নামের আগে পণ্ডিত ব্যবহৃত হলেও, তিনি পরে Declassed হয়ে নিজেই পাণ্ডিত্যহীন হয়ে নিজেকে শ্রীনেহরুরূপে বিজ্ঞাপিত করেছেন। সুতরাং তাঁর অভিমতের প্রতি সম্মান জানাতে নেহরুকে কিছুতেই ‘হিন্দু’ রূপে অপমানিত করা যায় না। হিন্দু জন্মকে অস্বীকার করে যিনি নিজেকে মহান করেছিলেন তাঁর উত্তরসূরীকে হিন্দু ব্রাহ্মণ শিবভক্ত সাজানোটা কতটা হাস্যকর তা বেশকারদের পক্ষে আন্দাজ করা শক্ত।

অহিন্দু নেহরুর পর তনয়া ইন্দিরা নেহরুর বিয়ে হয়েছিল পার্শিকুলখ্যাত ফিরোজ খানের সঙ্গে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা চলছে, পার্শি সম্প্রদায়ের বাইরে বিয়ে করলে তার আর পার্শি পরিচয় থাকে কিনা। বিয়ের পর ফিরোজ নানান কারসাজিতে অ্যাফিডেভিট করে খান থেকে গান্ধী হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু হিন্দু হয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না। যদি তা না হয়ে থাকেন, তিনি সেই পার্শি ধর্মেই ছিলেন। যেমন মহম্মদ আলি জিন্নাহ পার্শি বিয়ে করলেও তাঁর মেয়ে দিনা, জিন্নাই থাকেন

এবং তিনি আবার পার্শি বিয়ে করলে ওয়াদিয়া হন। সুতরাং স্বঘোষিত গান্ধী পদবিধারী সন্তানরা হিন্দু দাবি করলে তাঁরা অবশ্যই কুলভ্রষ্ট হিন্দু যার স্থান একমাত্র অন্ত্যজ সমাজে।

ধর্ম পরিচয়ে সেই ভেজাল হিন্দু পরিবারের সন্তান আবার বিয়ে করেছেন খেরেস্তান ক্যাথলিককে। ক্রিশ্চানদের মধ্যে পোপের অধীন ক্যাথলিক সম্প্রদায় আবার বিশেষভাবে রক্ষণশীল, যাঁদের পরিবারের কেউ অন্য ধর্মে বিয়ে করলে নিয়মানুযায়ী তাকে অবশ্যই ধর্মান্তরিত হয়ে হয়। বাইরে কোঁচার পত্তনে ধর্মের যে পরিচয়ই থাকুক না কেন, ভেতরে কিন্তু ছুঁচোর কেত্তনে ক্যাথলিক হতেই হয়। এখন বড়ো বড়ো পরিবারে ভেতরে কী হচ্ছে তা কাকে-পক্ষীতেও টের পায় না, কুতো মনুষ্য! সেই পার্শি-ক্যাথলিক কম্বিনেশনের গুণধর উত্তরসূরী যে উপবীতধারী ব্রাহ্মণ হতেই পারেন, সে বিষয়ে কংগ্রেসের কুব্জা পণ্ডিতরা যে সুনিশ্চয় তাতে আর সন্দেহ কী! কেননা রাঁধুনী বামুন থেকে মড়াপোড়া বামুন সকলেরই পরিচয় কিন্তু পৈতে দিয়ে। যতই লালন ফকির চেঁচান না কেন, বামুন চিনি পৈতে দিয়ে বামনি চিনি কীসে রে!

আসলে মানুষের যখন বুদ্ধিভ্রংশ হয়, বিশেষ করে লোভের হাতছানিতে, তখন তার কাছ থেকে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু আশা করাই বৃথা। জাতপাতের বিচার যেখানে সেই শ্রীচৈতন্যের আমল থেকে শুরু করে আর্যসমাজী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী বর্ণভেদের মূলে কুঠারাঘাতে করার জন্য সক্রিয় আন্দোলন করেছেন, সেখানে ভোটভিক্ষু এই নবব্রাহ্মণ্যবাদ এক মহান বুজরুকির উজ্জ্বল নিদর্শন। সেই মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য বলে গেছেন, 'দ্বিজোঽপি চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, হরিভক্তিপরায়ণঃ'; স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী তোমার রক্ত তোমার ভাই', আর্যসমাজী দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক সাম্যবাদ প্রচার করেছেন, সেখানে এই বর্ণসংকরের অবতারকে নিয়ে মেকি ব্রাহ্মণ্যবাদের ঢোল পেটানোর প্রহসনে চিত্ত চমৎকারা।

ওরে অতি বুদ্ধিমানের দল, মেকি সেকুলারিজমের নামে সাম্প্রদায়িক তোষণের মুখোশ খসে পড়ে ভোটের ভাঁড়ার শূন্য হয়েছে বলে, আজ ফোঁটা তিলক কেটে ভণ্ড ব্রাহ্মণ সাজলেই কি লোক ভোলানো যাবে! দেবতাসাজা বহুরূপীরা লোকের চোখ ভুলিয়ে মজার সৃষ্টি করলেও তাদের মেকিরূপে মন ভোলাতে পারে না। আসল সমস্যা তো ধর্ম বা সম্প্রদায় নিয়ে নয়, আসল সমস্যা তো প্রতারণা নিয়ে। ভারত তো ইতিহাসের ধারা বেয়ে সেকুলার; সকল ধর্মকে, অন্য সম্প্রদায়ের নিপীড়িতকে সম্মানের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছে। তার প্রমাণ সাম্প্রতিক তিব্বতি বৌদ্ধ ও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা মুসলমান। তার অর্থ এই নয় যে, ইসলামিক স্টেটের জঙ্গি জিহাদিদের প্রশ্রয় দিতে হবে। কেননা ভারতের মাত্র একটি মাত্র রাজ্যে যেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের দু'রবস্থা দেখেই সাবধান হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

একশো বছর আগে সাইক্লোনিক হিন্দু স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের পরিচয়ে যে পরমত-সহিষ্ণুতা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতার 'যত মত তত পথে'র জয়গান করেছেন, তার মূল সুরের অনুসরণ করলে ভারতে সেকুলারিজম মূর্ত হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু তা না করে গান্ধী-কংগ্রেস সেই খিলাফত আন্দোলন থেকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও শেষে পাকিস্তান স্বীকার করে কেবলই মুসলমান তোষণ করে গেছে। স্বাধীনতার পরে সেটাই পরিণত হয়েছে ধর্মান্ধ মোল্লা-তোষণে, আমজনতা মুসলমানকে বাদ দিয়ে। সেই জন্যেই কংগ্রেসের সেই মেকি সেকুলারিজমের প্রতারণা অবশেষে আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর প্রধান কৃতিত্ব সেই অ্যাপিজমেন্ট পলিটিকসের মূলে কুঠারাঘাত করা।

আজ কংগ্রেসের নব অবতারকে পৈতে পরিয়ে শিবভক্তের পুতুলনাচে মানুষ মজা পেতে পারে কিন্তু তাতে ভোটের বাজারে কাজের কাজ হওয়া সুদূর পরাহত। প্রয়াত রাজীব গান্ধী একসময় একাধারে মুসলমান ও হিন্দুত্রাতা সাজতে গিয়ে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারান। আজ আবার সেই মূর্খের রাজত্ব সৃষ্টির চেষ্টা। অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। ভণ্ড ব্রাহ্মণ সাজার থেকে যথার্থ সেকুলার হলে বোধহয় তাতে বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিতে ঈপ্সিত ফল মিলতে পারতো। ▮

বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ সঙ্ঘ পরিচালিত

স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির (উচ্চ বিদ্যালয়)

(School Code-362 of D.S.E., WB)

সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দির (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

(Code No. 19080502302 of D.I.S.E.)

এবং

বিবেকানন্দ শিশুতীর্থ ছাত্রাবাস

(ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা)

ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ও প্রস্পেক্টাস সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য ১৫০ টাকা Demand Draff Birbhum Vevekananda Seva-O-Seksha Vekash Sangha এর নামে কেটে অথবা উক্ত সঙ্ঘের নামে Indian Bank, Swci Branch, A/c. No. 6138735800-তে Deposit করার পর এসএমএস করে নাম-ঠিকানা, ফোনে অথবা নীচের ঠিকানায় পত্র মারফত জানাবেন।

সম্পাদক, বীরভূম বিবেকানন্দ সেবা ও শিক্ষা বিকাশ শিশুমন্দির ভবন

বিবেকানন্দপল্লী, সিউড়ী, বীরভূম

Phone No. 9232685987/9091102646/9474614428

চিঠিপত্র

জাতীয় সঙ্গীত ইসলাম বিরোধী?

স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যের সব মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক— উত্তরপ্রদেশ সরকার এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে। আর এই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কয়েকটি মাদ্রাসা। তাদের অভিযোগ, জাতীয় সঙ্গীত ইসলাম বিরোধী। 'জনগণমন' গাইলে আল্লাহ্‌র অসম্মান হয়। কিন্তু মহামান্য আদালত যোগী-সরকারের নির্দেশকে বহাল রেখে সাফ জানিয়ে দিয়েছে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতকে সবারই সম্মান জানানো উচিত। এই ঐতিহাসিক রায়ে যোগী-সরকারের নৈতিক জয় হয়। হয় ভারতীয় জাতীয়তারও জয়।

উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশে নথিভুক্ত মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। এদের মধ্যে মাত্র ৫৬০টি মাদ্রাসা সরকারি সাহায্য পায়। বাকিগুলি স্বশাসিত বা বেসরকারি। অর্থাৎ ৯৩ শতাংশ মাদ্রাসা প্রাইভেট। এইসব মাদ্রাসা মূলত ইসলামিক দেশগুলির অনুদানে পুষ্ট। তাই সেখানে ইসলামিক শিক্ষাই পাচ্ছে প্রাধান্য। খারিজি মাদ্রাসাগুলির শিক্ষা কোরান ও হাদিস ভিত্তিক হওয়ায় শিক্ষার্থীরা চিন্তা-চেতনায় হয়ে ওঠে এক একজন আরবীয়। তাই অনেকেরই মানসিকতায় জন্ম নেয় প্যান ইসলাম বা ইসলামিক ব্রাদারহুডের ভাবনা। অর্থাৎ, ইসলামিক দুনিয়া সৃষ্টির ভাবনা সর্বদা তাদের তাড়া করে বেড়াতে থাকে। ফলশ্রুতিতে কেউ কেউ ইসলাম ও আল্লাহ্‌র দাসানুদাস হতে গিয়ে হয়ে ওঠে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী বা জঙ্গি। ইসলামের দোহাই দিয়ে করে রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতির বিরোধিতা। উত্তরপ্রদেশে যোগী-সরকারের নির্দেশের বিরোধিতা 'জেহাদি' মানসিকতারই পরিচায়ক।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

তাজ-বিতর্ক

বেশ কিছুদিন যাবৎ তাজমহল ঘিরে বিতর্ক চলছে। পত্র-পত্রিকা টিভি চ্যানেলগুলোতে জমজমাট বিতর্ক সভা। তাজমহল যদি সত্যি শাহজাহানের তৈরি হয়ে থাকে তবে এত বিতর্ক কেন? ইতিহাসে যা লেখা আছে, নতুন করে চিন্তা ভাবনার সময় হয়েছে। ভারতের ইতিহাস মুসলমান যুগে মুসলমান লেখক এবং ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ লেখকগণ নিজের মতো করে লিখেছেন। ভারতীয় তথা হিন্দুদের ছোট করার উদ্দেশ্যে। ভারতের স্থাপত্যশিল্প যা কিছু হয়েছে তা সবই মোগল বাদশা ও ব্রিটিশদের মাধ্যমে। এর আগে ভারতীয় রাজন্যবর্গ কিছুই করেননি। এভাবেই ভারতীয়দের ছোট করে বিশ্বদরবারে তুলে ধরা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে শিশুদের ভুল ইতিহাস শিক্ষা দিয়ে মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে। মুসলমান ও ব্রিটিশ লেখকদের লেখা পড়ে তথাকথিত পাশ্চাত্য ভাবনায় ভাবিত বর্তমানকালের ইতিহাসবিদগণ সেই ভাবেই ইতিহাস লিখেছেন। নিজেরা বিশ্বাস করুন বা নাই করুন। মুসলমানরা এদেশে এসে হিন্দু মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করেছে। মালদার গৌড়ে গেলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাবরি ধাঁচা নিয়ে কিছু লোকের চোখের জল শুকায়নি এখনও। সুযোগ পেলেই মড়াকান্না শুরু করে দেন। অথচ বিদেশি সংস্থার দ্বারা খননের ফলে প্রমাণিত হয়েছে বাবরি ধাঁচা আসলে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির ছিল। তাজমহলে খনন কার্য চালালে প্রমাণিত হবে তাজমহল মসজিদ নয় হিন্দু মন্দির ছিল।

শাহজাহান জোর করে দখল নিয়ে বুরহানপুর কবর থেকে মমতাজের দেহ তুলে এনে তেজোমহলে কবরস্থ করে তাজমহল নামকরণ করেন। কবরস্থ করার বহু পূর্বেই তাজমহল দখল করেন। তখন কিছু কিছু জায়গায় ফাটল ধরেছিল। মেরামতের নির্দেশ দিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব। এক পত্র মারফত পিতা শাহজাহানকে তা জানিয়েছিলেন। মমতাজের মৃত্যুর বহু বছর পূর্বে দখল নেওয়া সত্ত্বেও মমতাজকে বুরহানপুরে কবরস্থ করার কারণ কী? কারণ তাজমহল মেরামতের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া কোরানের বাণী খোদাই করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। কোরানের বাণী খোদাই করতে অর্থ ও সময় লেগেছিল। ওই কাজের সময় তাজমহলকে ঘিরে রেখে দেওয়া হয়েছিল। খোদাই কাজ শেষ হওয়ার পর যখন জনসাধারণের গোচরে এল তখন সবাই জানল তাজমহল শাহজাহান তৈরি করেছেন।

এই প্রচার চালানো হয়। P.N. Oak-এর লেখা 'The Tajmahal is a Temple Palace' বইখানি পড়তে হবে। ভাষান্তর— দীপক ভট্টাচার্য, প্রকাশক অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ৩৬, কলেজ রো, কলকাতা-৯। P.N. Oak মুসলমান ইতিহাস লেখকদের লেখা এবং বিদেশি পর্যটকদের লেখা থেকে প্রমাণ-সহ লিপিবদ্ধ করেছেন। কারও লেখাতেই তাজমহল শাহজাহানের তৈরি উল্লেখ নেই।

তাজমহল নিয়ে অযথা বিতর্ক না করে খনন করলেই সঠিক তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাহলে সকল বির্তকের অবসান ঘটবে। মুসলমান মতে ওদের মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসার সবগুলো দরজা থাকবে ঘরের পূর্বদিকে। তাজমহলে ঢুকতে গেলে পূর্বমুখে ঢুকতে হচ্ছে, অর্থাৎ তাজমহলের পশ্চিমদিকে প্রবেশপথ যা ইসলাম বিরোধী। ফুল, লতাপাতা ইত্যাদির প্রতীকও ইসলাম বিরোধী। তাজমহলের নীচে আরও কিছু কক্ষ আছে। খনন করলে সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসবে।

—**অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,**
দেবী বাড়ি, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

ডক্টরেট ডিগ্রি

শিক্ষার ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সুদূর অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরই আলোচিত হতো। সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একজনকে ভাষার ক্ষেত্রে ডক্টরেট দিতে চলেছে যার কথাবার্তা ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। তবে সাময়িক বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে রাজনৈতিক বিরোধিতার জন্য। নামজাদা এই বিশ্ববিদ্যালয় কি জানে না কর্মে থাকাকালীন এভাবে কোনো ব্যক্তিকে কোনো উপাধি দান করা যায় না, নাকি এটা ওই প্রতিষ্ঠানের চাটুকারিতার উলঙ্গ নিদর্শন।

যাঁকে ওইরূপ অনৈতিক ও বেআইনি ভাবে উপাধি দেওয়া হচ্ছে তাঁর অবশ্য এর পূর্বেও অস্তিত্বহীন 'ইস্ট জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পেয়েছি' বলতেও দ্বিধা বা সংকোচ হয়নি এবং বর্তমানেও নীরব থাকাই সমীচীন মনে করছেন। ভাষার ক্ষেত্রে কাউকে ডক্টরেট দেবার পূর্বে এটা দেখা উচিত তিনি যাতে ভবিষতে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতে না পারেন কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাবেন।

সেবার পার্কস্ট্রিট ধর্ষণকাণ্ডে ক্যাবারে ড্যান্সারদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'ওরা রাতে রাস্তায় বের হয় কেন।' ব্যাপারটি ধামাচাপা দেওয়াই ছিল লক্ষ্য। ধর্ষকরা ছিল সকলেই নিজ দলের ক্যাডার। দময়ন্তী সেন কর্তৃক সেইসব ধর্ষকরা ধরা পড়াতে রাগে তিনি তাঁর পদাবনতি ঘটিয়েছিলেন। যার পর দময়ন্তী সেনের পিতা দীপক কুমার ঘোষের লেখা 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন দেখেছি' বইটি বের হয়। বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পড়ার সুযোগ হয়নি। তাহলে এই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিতেন না। একবার নির্বাচনের সময় কোনো এক বিডিওর কাজে কিছু ত্রুটি হওয়াতে তিনি বলেছিলেন 'চড় মেরে গাল লাল করে দেব'। যাঁর আমলে সারদা, নারদার ন্যায় অর্থ তছরূপের ঘটনা ঘটে চলেছে সেই ব্যক্তিকে স্বনামধন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষায় কী করে ডক্টরেট দেবার প্রয়াসী হয় সেটা আশ্চর্যের কথা।

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী, বর্ধমান।

পদ্মাবতী : জানা-অজানা কথা

'পদ্মাবতী' সিনেমা নিয়ে প্রতিবাদ চলছে দেশ জুড়ে। প্রতিবাদ হওয়াই স্বাভাবিক, না হওয়াটাই ছিল অস্বাভাবিক। প্রসঙ্গত পদ্মিনী নিয়ে কিছু জানা-অজানা কথা জানা জরুরি।

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করে রানি কমলাদেবীকে বিয়ে করে। কমলাদেবীর কন্যা দেবলাদেবীকে নিয়ে পিতা রাজা কর্ণ দক্ষিণের দেবগিরিতে পালাতে বাধ্য হন। পালাতে ব্যর্থ হলে দেবলাদেবীর অবস্থা কমলাদেবীর মতোই হতো। আবার ৫ বছর পর ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করে আলাউদ্দিন। চিতোরের পতন হলে রানি পদ্মিনী ও তাঁর সহচরীরা জহরব্রত পালন করে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। জহরব্রত না করলে তাঁদের অবস্থা হতো রানি কমলাদেবীর মতো। যার হাত থেকে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য পদ্মিনী আত্মাহুতি দিয়েছিলেন সেই আলাউদ্দিন খিলজির সঙ্গে পদ্মিনীর প্রণয়দৃশ্য বনসালি দেখান কী করে? শিল্পসৃষ্টি আর শিল্পীর স্বাধীনতার ধ্বজাধারী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের জানা উচিত শিল্পীর স্বাধীনতার নামে অপরের মর্যাদাহানি করা যায় না। বনসালিরা শুধু ইতিহাসই বিকৃত করেননি, তাঁরা ভারতীয় নারীর মর্যাদা হানি করার অপপ্রয়াস করছেন। উল্লেখ্য, আজমেঢ়স্থিত দরগাহের দিওয়ান সইদ জইনুল আবেদিন আলি খান পদ্মাবতী ছবির বিরোধিতা করেছেন। তাই বনসালি এবং তাঁর সমর্থকদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নারীজাতির কাছে।

প্রসঙ্গত, ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গিরের সঙ্গে মেবারের রানা প্রতাপের পুত্র অমর সিংহের এক চুক্তিপত্রের কথা লিখতে হয়। চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল—রানা পরিবারের কোনো কুমারী কন্যা মুগল হারামে যাবে না। অর্থাৎ সে যুগে কুমারীদের হারামে পাঠাতে বাধ্য করা হতো। মুসলমান আমলে এরূপই করুণ অবস্থা ছিল হিন্দু নারীদের। বনসালিরা করুণ অবস্থা না দেখিয়ে, দেখাতে চেয়েছেন অবাস্তব প্রণয়দৃশ্য! লজ্জা! এর থেকে বড় লজ্জা কী হতে পারে?

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

হরিয়ানার কন্যা

কন্যা সন্তান রয়েছে জঠরে
গিয়েছে যখন জানা,
বাড়তে দিও না তাকে আর বেশি
রেখে দশমাস টানা।
কন্যা মানে তো পণ দিয়ে বিয়ে,
বধূ হয়ে যন্ত্রণা—
কন্যা মানে তো অনাচারী স্বামী,
পদে পদে লাঞ্ছনা।
জীবন থাকলেই জীবন হয় না
যদি না থাকে তাতে মান—
মেয়ের দুঃখে যদি ভরে থাকে
বাপ ও মায়ের প্রাণ।
হরিয়ানা জুড়ে কন্যাভ্রূণের
হত্যা চলত তাই,
গণনায় মেয়ে গেল কত কমে
তবুও চেতনা নাই।
হরিয়ানী মেয়ে রানি, গীতা, দীপা
মুনসী ও সবিতারা
বেঁচেছিল বলে রূপে গুণে তারা
আজ জগতের সেরা।
তাদের গর্বে গর্বিত আজ
দেশ ও রাজ্যবাসী
কন্যাজাতক রাখলে বাঁচিয়ে
বাঁচবে মুখের হাসি।।

—গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলকাতা-৭৮।

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির কথা

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বাংলা পঞ্জিকাবর্ষের অষ্টম মাস অগ্রহায়ণ। হেমন্ত-মরসুমের পরিসমাপ্তিতে পাকা ধানকে কেন্দ্র করেই তার কৃষি-সংস্কৃতি। অঘ্রাণ খেতে 'মধুর হাসি', 'ফসলের সুবর্ণ যুগ' নিয়ে আসে, আর তাই এ 'লক্ষ্মীর মাস'। ব্রীহি ধানের উৎপাদন প্রাবল্যেই একসময় অঘ্রাণকে বছরের প্রথম মাস বা 'মার্গশীর্ষ' ধরা হতো। বছরের আগে আসে বলেই অগ্রহায়ণ (অগ্র = আগে, হায়ণ = বছর); তার সংক্রান্তি বা সঞ্চারেও তাই ধান্যলক্ষ্মীর পারিপাট্য। এই সময়ে আকাশে 'মৃগশিরা' তারার চাহনি; সেই থেকেই 'মার্গশীর্ষ'। 'গণদেবতা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, ''অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে খামারে লক্ষ্মী পাতিয়া চিড়া-মুড়কি, মুড়ি, মুড়ির নাড়ু, কলাই ভাজা পুজো হইয়াছিল।''

রাঢ় অঞ্চলে হৈমন্তী ধান মাড়াই ও ঝাড়াইয়ের শুভ পর্ব হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় ইতুলক্ষ্মী ব্রত। কার্তিক সংক্রান্তিতে যে ইতু পুজোর সূত্রপাত, অঘ্রাণের রবিবারগুলিতে তার মেয়েলি আরাধনার পর অঘ্রাণ সংক্রান্তিতে তার পরিসমাপ্তি। সেদিন ইতুর ঘট স্নান করিয়ে, দূর্বা, গাঁদাফুল-চন্দনে সাজিয়ে, নতুন আতপ চালে তৈরি মুঠোপিঠে নিবেদন করে উমনো-ঝুমনোর ব্রতোপাখ্যান শুনতে হয়। কাহিনিটি এক আত্মভোগসর্বস্ব ব্রাহ্মণের গল্প। পিতার দ্বারা বনে নির্বাসিতা হয়ে দুই বোন সূর্যদেবতার অনুগ্রহে সুখ-সম্পদ লাভ করে। ইতু আসলে 'মিত্র' বা সূর্যোপাসনা। ইতুব্রতের কথার সঙ্গে এইদিন পূর্ববঙ্গে পালিত চুঙি-ব্রতকথার প্রভূত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চুঙি-ব্রতকথা শুনতে হয় চুঙি বা নলগাছের পর্বমধ্য অংশে একুশ গাছি দূর্বা ও একুশ গাছি আলো চাল ভরে, হাতে নিয়ে।

ইতু ব্রতের মুঠোপিঠে তৈরি হয় চালের গুঁড়ো, কলা, নারকেল, গুড় দুধে মেখে তার মণ্ড করে। মণ্ডগুলি হাতের মুঠোয় ডিম্বাকৃতি করা হয়, ভেতরে ভরা হয় একুশটি আতপ চাল, তা দুধে-খেজুর গুড়ে সেদ্ধ করা হয়। সংক্রান্তির পরদিন ভোরবেলা ইতু-সরা (নানান ফসলে/উদ্ভিদে পরিপূর্ণ নান্দনিক সরা) নদীতে বা জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। সরার গাছগুলি হলো শুশনি, কলমি, কচু, ছোলা, মটর, মুগ, কলাই এবং যব। অঞ্চলভেদে তার পার্থক্যও চোখে পড়ে। ইতু পুজোর মন্ত্র এইরকম— ''শুশনি কলমি লকলক করে, / রাজার ব্যাটা পক্ষী মারে / মারুক পক্ষী শুকোক বিল, / সোনার কৌটো রুপোর খিল, / গুটি গুটি চাদনের বাটি, / বেড়ার চাঁপাফুল / এই নিয়ে তুষ্ট হও / বাবা ইতু ঠাকুর, / ইতু ঠাকুরকে চাই বর, / ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর।''

অঘ্রাণ সংক্রান্তির দিনেই শুরু হয় মেয়েলি ব্রত 'তুষ-তুষলী'। সারা পৌষ উদ্‌যাপনের পর শেষ হয় পৌষ সংক্রান্তিতে। ধানের ভেতরের শস্যদানা বের হবার পর পড়ে থাকে তার হলদেটে- বাদামি খোসা। নতুন ধানের তুষ নিয়ে কালো গাইয়ের গোবর মেখে তৈরি হয় বর্তুল— কোথাও ১৪৪টি, কোথাও ১২৪/৬২/৩১টি। এই গোবর-তুষলীগুলির মাথায় গোঁজা হয় পাঁচগাছি দূর্বা। অঘ্রাণ সংক্রান্তির দিন কোথাও কোথাও কোনো ব্রাহ্মণ গুলিগুলোকে উৎসর্গ করে দেন; তারপর থেকেই তুষলীর পুজো শুরু হয়ে যায়। তুষ-তুষলীকে নারায়ণ ও লক্ষ্মী জ্ঞানে পুজো করে কুমারী মেয়েরা। পৌষ সংক্রান্তিতে তুষলীর মালসায় অগ্নিসংযোগ করে জলে ভাসিয়ে স্নান করে আসতে হয়। এই ব্রত করলে পিতৃ ও শ্বশুরকুলের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়ে বলে বিশ্বাস। বাণিজ্যে বা প্রবাসে বসবাসকারী বাবা-ভাই-স্বামী-পুত্রের নিরাপদ জীবন ও প্রত্যাবর্তনের কামনায় অনেকে তুষ-তুষলীর ব্রত করেন। রাঢ় বাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান, হুগলী জেলায় অঘ্রাণ সংক্রান্তিতে শুরু হয় টুসু উৎসব। এই উৎসবের মূল কেন্দ্রবিন্দু তার গান। মকর সংক্রান্তিতে টুসু বিসর্জন। প্রাচীন বাংলার তুষালি ব্রতই হয়তো টুসুতে উৎসবে পরিণত হয়েছে।

অঘ্রাণ সংক্রান্তিতে শুরু হয় সর্বজয়াব্রত। প্রতি সংক্রান্তিতে এক একটি সামগ্রী বিপ্র-সাম্প্রদানিক বাক্যে ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করে সেই মাসে তার ব্যবহার থেকে বিরত হন ব্রতিনী। সেই হিসেবে অঘ্রাণ সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণকে শাক প্রদান করা হয়। পরের বছর অঘ্রাণ সংক্রান্তিতে এই ব্রতের সমাপ্তি। এইভাবে অন্যান্য দান সামগ্রী হলো লবণ, তেল, সুপারি পুষ্পমাল্য, অন্নভোগ, ধারাজল, দই, বস্ত্র, চামর, ঘি এবং শয্যা।

সেঁজুতি ব্রতের সমাপ্তি অঘ্রাণ সংক্রান্তিতে যা শুরু হয় কার্তিক সংক্রান্তিতে। এটি সান্ধ্যকালীন কুমারী ব্রত; আঙিনায় আলপনা ও প্রদীপ জ্বালিয়ে যার উদযাপন। আলপনায় কামনাত্মক বাহান্ন রকমের ছবি আর মনস্কামনা পূরণের বাহান্ন ছড়ার আবৃত্তি--- তাতে নারীজীবনের সুখ-দুঃখের অকপট অভিব্যক্তি। শিব, মন্দির, গঙ্গা-যমুনা, বাসগৃহ, গৃহস্বামী, রান্নাঘর, ঢেঁকি, তৈজসপত্র, গয়নাগাটি, গাছপালা প্রভৃতির আলপনায় গ্রামবাংলার বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। সাংসারিক সুখ-শান্তির জীবন কামনা এই ব্রত পালনের মূল উদ্দেশ্য।

সেঁজুতি ব্রতের ছড়া— ''সাঁঝ-পূজন সেঁজুতি/বারো মাসে বারো সতী / তার এক মাসে এক সতী/সতী হয়ে মাগলাম বর / ধনে-পুত্রে ভরুক বাপ-মার ঘর।'' ■

মহাভারতের অপ্রধান নারী চরিত্র
চিত্রাঙ্গদা

দেবপ্রসাদ মজুমদার

মহাভারতের অপ্রধান নারী চরিত্রগুলির মধ্যে চিত্রাঙ্গদা স্বমহিমায় ভাস্বর। চিত্রাঙ্গদা অত্যন্ত সুন্দরী, তাঁকে দেখা মাত্রই অর্জুন মুগ্ধ হন— 'চিত্রাঙ্গদা চৈব নরেন্দ্রকন্যা। মৈষা সবর্ণার্দ্রমধুক পুষ্পৈবাঃ'— রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গাত্রচর্ম আর্দ্র মধুক (মহুয়া) ফুলের মতো। মহাভারতকার ব্যতিরেকে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদাকে আমাদের কাছে অধিক পরিচিত করেছেন। মণিপুররাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদা। ওই বংশের অন্যতম প্রধানপুরুষ রাজা প্রভঞ্জন মহাদেবের তপস্যা করে বর লাভ করেন যে, তাঁর বংশের প্রত্যেক পুরুষই একটিমাত্র সন্তানলাভের অধিকারী হবে। কালক্রমে মণিপুররাজ চিত্রবাহনের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্যাকে রাজা পুত্রের মতো লালন পালন করেন ও শিক্ষা দেন।

এদিকে দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে বাধ্য হওয়ায় পূর্ব নির্ধারিত শর্তানুসারে অর্জুনকে বারো বছর ব্রহ্মচর্য পালন করে অরণ্যে বাস করতে হয়। রাজধানী ত্যাগ করে অর্জুন গৃহত্যাগী হন ও তারপর নানা তীর্থ ভ্রমণ করে হরিদ্বারে উপস্থিত হলে গঙ্গাস্নান কালে নাগকন্যা উলূপী তাঁকে আকর্ষণ করে নাগলোকে নিয়ে যান। এরপর উলূপীর প্রার্থনা পূরণ করে, অর্জুন আবার বের হন ও মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হন। মণিপুররাজ চিত্রবাহনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অর্জুন রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে মুগ্ধ হন। চিত্রবাহনের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে অর্জুন রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে প্রার্থনা করেন। রাজা চিত্রবাহন বলেন ওই কন্যা তাঁর একমাত্র সন্তান, তাঁদের সন্তান মণিপুর রাজ্যের বংশধর ও রাজা হবে এই শর্তে তিনি অর্জুনকে কন্যাদান করতে সম্মত আছেন। অর্জুন ওই শর্তে রাজি হলে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। এরপর অর্জুন মণিপুরে তিন বছর অতিবাহিত করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁর বভ্রুবাহন নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। অর্জুন মণিপুর ত্যাগকালে সমাতৃক বভ্রুবাহন মাতামহের গৃহেই থেকে যান। এরপর তিন বছর তীর্থভ্রমণ শেষ করে চিত্রাঙ্গদা ও পুত্র বভ্রুবাহনকে দেখবার জন্য অর্জুন আবার মণিপুরে উপস্থিত হন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় পুনরায় দেখা হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্জুন মণিপুর ত্যাগ করেন।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জুন অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে নানা দেশ জয় করে মণিপুরে এসে উপস্থিত হন। মণিপুরে অর্জুনপুত্র বভ্রুবাহন পিতাকে ভক্তিভরে অভ্যর্থনা করলেন। যুদ্ধকামী অর্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের এরূপ অভ্যর্থনাকে অত্যন্ত কাপুরুষোচিত মনে করে ধিক্কার দিলেন। ওই সময় হঠাৎ আবির্ভূত হলেন অর্জুন পত্নী নাগকন্যা উলূপী। বভ্রুবাহনের সামনে তিনি নিজেকে মাতৃরূপে পরিচয় দিয়ে বললেন— বৎস, যুদ্ধার্থী পিতাকে যুদ্ধদ্বারাই পরিতৃপ্ত করা উচিত, এটাই স্বধর্ম পালন। এরপর আমরা দেখতে পাই বিমাতার পরামর্শে বভ্রুবাহন হঠাৎই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন এবং যজ্ঞাশ্ব অবরোধ করে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছেন। এই যুদ্ধে বভ্রুবাহনের বাণে অর্জুন নিহত হন, আর বভ্রুবাহনও নিজেকে পিতৃহন্তা মনে করে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এইরূপে নিদারুণ মর্মান্তিক সময়ে বভ্রুবাহন জননী চিত্রাঙ্গদা এসে উপস্থিত হন। তিনিও স্বামীর মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকতপ্ত হন। এরপর পুত্রকে পিতার সঙ্গে যুদ্ধে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করবার জন্য তিনি উলূপীকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে থাকেন।

অর্জুনের এই মৃত্যুর মূল কারণ কুরুক্ষেত্রের মহারণে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে বাণবিদ্ধ করা। এই ভাবে ভীষ্মকে পরাজিত করবার জন্য গঙ্গাদেবী ও অষ্ট বসুরা অর্জুনকে নরকে যাবার অভিশাপ দিয়েছিলেন। ওই অভিশাপের কথা জানতে পেরে উলূপী তৎক্ষণাৎ নিজের পিতার কাছে গিয়ে জানান। উলূপীর পিতা কৌরব্য অর্জুনের শাপমোচনের জন্য বারম্বার বসুগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা জানালে বসুগণ বলেন যে পুত্র বভ্রুবাহনের বাণে অর্জুন রণভূমিতে লুটিয়ে পড়লেই তিনি শাপমুক্ত হবেন, আর ওই শাপমোচনের জন্য উলূপী যথা সময়ে পুত্র বভ্রুবাহনকে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করেন। এরপর উলূপী নাগলোক থেকে সঞ্জীবনী দিব্যমণি এনে অর্জুনকে জীবিত করেন।

এরপর সবাইকে অশ্বমেধ যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানিয়ে অর্জুন যজ্ঞাশ্ব নিয়ে মণিপুর থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। যথাসময়ে যজ্ঞকালে বভ্রুবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীকে নিয়ে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হন। ওই সময় কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদির আদর যত্নে বভ্রুবাহন বিশেষভাবে আপ্যায়িত হন। আর কুন্তী, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার আদর যত্নে উলূপী ও চিত্রাঙ্গদা বিশেষ ভাবে আপ্যায়িত হন। যজ্ঞ অবসানে বভ্রুবাহন পিতামহী, পিতৃব্যগণ ও পিতার প্রদত্ত বহু মূল্যবান স্নেহ উপহার সামগ্রী লাভ করে আনন্দে মণিপুরে ফিরে যান। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী হস্তিনাপুরেই থেকে যান। দ্রৌপদী ও সুভদ্রার সঙ্গে তাঁরাও মাতা গান্ধারীর সেবা যত্ন করেছিলেন। এর পর আশ্রমিক পর্বে লক্ষ্য করা যায় যে কুন্তীদেবীকে দর্শনের জন্য তাঁরা অরণ্যে আশ্রমে গিয়েছিলেন। এরপর তাঁরা হস্তিনাপুরেই বাস করতে থাকেন। পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করার পর চিত্রাঙ্গদা আর হস্তিনাপুরে থাকেননি। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই মণিপুর যাত্রা করেন। এরপর মহাভারতকার চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে আর কিছুই বর্ণনা করেননি। ■

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

জোহান গটফ্রিড হার্ডার : (১৭৪৪-১৮০৩)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন জার্মানির শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, কবি ও সাহিত্য সমালোচক এবং ইউরোপের 'জ্ঞানোদয় কালের' পুরোধাপুরুষ। তাঁর লেখাগুলি পরবর্তীকালে হেগেল এবং গ্যেটেকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

উদ্ধৃতি : আমি 'শকুন্তলা'র চেয়ে চিত্তগ্রাহী মানবসৃষ্ট আর কোনো কিছু সহজে খুঁজে পাইনি যা ছিল প্রাচ্যের প্রথম এবং সর্বোৎকৃষ্ট কুসুমিত পুষ্পস্বরূপ। সত্য বলতে কী এমন জিনিসের আবির্ভাব হয় প্রতি দুই হাজার বছরে একবার মাত্র

উদ্ধৃতি : 'ওহে পবিত্র ভূমি ভারত! তোমাকে আমি প্রণাম জানাই। তুমি সমস্ত রাগরাগিণীর উৎসস্থল, তুমি তপ্ত হৃদয়ের ভাষা এবং দেখ, দেখ হে, প্রাচ্য ভূমি, তুমিই মানব জাতির শৈশবের দোলনা, তুমিই মানুষের অনুভূতি আর তুমিই সমস্ত ধর্ম দর্শনশাস্ত্রের মাতৃভূমি।

উৎস : জাং অ্যান্ড ইস্টার্ন থট্‌সঃ এ ডায়ালগ উইথ দ্য ওরিয়েন্ট— জন জেম্‌স ক্লার্ক।

ভি. এস. নইপল : (১৯৩২-)

পরিচিতি : ইনি বিখ্যাত ইন্দো-ত্রিনিদাদ ব্রিটিশ সাহিত্যিক। ২০০১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁকে বলা হয় 'আধুনিক ইংরেজি গদ্যের জাদুকর'। তিনি বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন যেমন, 'সমারসেট মম' পুরস্কার (১৯৬০), 'বুকার প্রাইজ' এবং 'ডেভিড কোহেন প্রাইজ', যা তাঁর জীবদ্দশায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (১৯৯৩)।

উদ্ধৃতি : হিন্দুধর্মের মূলসূত্র হচ্ছে নির্ভুল সত্য নির্ভর পন্থা, যা শাস্ত্র অনুমোদিত, প্রাণবন্ত এবং নমনীয় এক পদ্ধতি, যা প্রতিটি মানুষের গুণপ্রকৃতির স্বরূপ অনুসারে প্রযোজ্য। এর চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে, আত্মানুসন্ধান এবং পূর্ণসত্য সন্ধানের সংযুক্তি, কর্মযোগের সাহায্যে পূর্ণতা প্রাপ্তি, যেন সেটাই হবে মানবরূপী জাহাজের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুরস্কার।

উৎস : ইন্ডিয়াঃ এ উন্ডেড সিভিলাইজেশন—ভিএস. নইপল।

রালফ ওয়ালডো এমারসন : (১৮০৩-১৮৮২)

পরিচিতি : ইনি হলেন আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক, লেখক, অধ্যাপক এবং একত্ববাদী ধর্মযাজক। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে অতীন্দ্রিয়বাদের পুরোধাপুরুষ। তাঁর লেখা পড়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যেমন হেনরি ডেভিড থরো, ফ্রেডরিক নিট্‌শে, উইলিয়াম জেমস, এমিল আরমান্ড, এমা গোল্ডম্যান, মারসেল প্রাউস এবং হারল্ড ব্লুম বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

উদ্ধৃতি : ভারতীয় ঋষিদের শিক্ষার মাধ্যম ছিল পৌরাণিক কাহিনির দ্বারা রূপকধর্মী নীতিকথা। যা ছিল সহজ অথচ শ্রেষ্ঠ ধর্ম যেন ঐশ্বর্যশালী অবগুণ্ঠনে ঢাকা মহিমাময়ী মহারানির মুখাবয়ব। এটা শেখায় সত্য বলতে, অপরকে ভালবাসতে এবং ঐহিক বিষয়কে অনিত্য জ্ঞান করতে। প্রাচ্য হচ্ছে মহান এবং এর তুলনায় ইউরোপ হচ্ছে অতি তুচ্ছ একটি দেশ। এই মহান দেশে সমস্ত কিছুই হচ্ছে আত্মার প্রতিচ্ছবি এবং আত্মাই হচ্ছে সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর।

উৎস : দ্য ওয়েস্ট লুক্‌স অ্যাট্ ইন্ডিয়া—কৃষ্ণানন্দ যোশী।

উদ্ধৃতি : প্রকৃতির গুণেই একজন সরাসরি ব্রাহ্মণ হতে পারে। আত্মার পুনর্জন্মবাদ কোনো মিথ্যা উপকথা নয়।

উৎস : অটোবায়োগ্রাফি অব এ যোগী— পরমহংস যোগানন্দ।

বারাক হুসেন ওবামা : (১৯৬১-)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন আমেরিকার ৪৪তম প্রেসিডেন্ট। তিনি শান্তির জন্য ২০০৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

উদ্ধৃতি : ভারতের শক্তি নিহিত আছে তার বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের সমন্বয়ের মধ্যে; বিভাজনের মধ্যে বিলীন হওয়ার মধ্যে নয়। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে পরিব্রাজক বিশ্বগৌরব স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন আমার শহর শিকাগোতে যেখানে সমস্ত ধর্মের সংহতির কথা উচ্চারিত হয়েছিল।

উদ্ধৃতি : ভারত শুধু আমাদের মনের দরজাই খুলে দেয়নি, আমাদের নৈতিকতার পরিধির বিস্তারও ঘটিয়েছে। তার ধর্মগ্রন্থগুলি শিখিয়েছে মর্যাদাপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের বিধি। সেই দেশের কবি গান গেয়েছেন, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' এবং সেখানেই শোনা যায় ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রীতি ও ন্যায় বিচারের বাণী।

উৎস : ২০১০ সালে ভারতের সংসদে, বারাক ওবামার দেওয়া ভাষণ থেকে।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

স্টকারদের দৌরাত্ম্য খর্ব করতে মহিলাদেরই উদ্যোগী হতে হবে

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

কয়েক বছর আগেও স্টকিং শব্দটা আমাদের কাছে এত পরিচিত ছিল না, অথচ বর্তমানে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার মাধ্যমে স্টকিং সম্বন্ধে একটু-আধটু আবছা ধারণা তৈরি হয়েছে। স্টকিং মানে কেবলমাত্র মেয়েদের অনুসরণ করে বিরক্ত করাই নয়, আজকের প্রযুক্তির দিনে বিভিন্ন ভাবে, যেমন অবাঞ্ছিত ফোন করে, এসএমএসে আপত্তিজনক মন্তব্য পাঠিয়ে বা অসন্তোষজনক ই-মেলের মাধ্যমে মহিলাদের বিরক্ত করাও স্টকিংয়ের মধ্যে পড়ে। এটি এমন একটি মানসিক আবেগ, যাতে কোনো কারণে একজন মহিলা যদি কোনো পুরুষকে সামান্য সহানুভূতি দেখিয়ে থাকেন, তাহলে ওই পুরুষটি এই ঘটনায় ওই মহিলার প্রতি আকর্ষণ ভেবে নেয়। নিষেধ সত্ত্বেও সে তখন ওই মহিলাকে নানাভাবে বিরক্ত করতে থাকে— কখনও অবাঞ্ছিত অনুসরণ করে বা বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে। কিন্তু পুরুষ যৌন বিকৃতির প্রকাশস্বরূপ মাহিলাদের বিরক্ত করে খুশি হয়, কারুর কাছে এটি পৌরুষ দেখাবার একটি মাধ্যমমাত্র, কেউ বা প্রথম প্রেমে বিফল হয়ে কোনো মেয়েকে পাগলের মতো অনুসরণ করতে থাকে এবং তাকে পাবার জন্য যা খুশি তাই করতে পারে।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে স্টকিংকে ভালোভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে। প্রায়শই সেখানে দেখা যায় যে, একটি যুবক কোনো একটি মেয়েকে অনুসরণ করে নানাভাবে তার বিরক্তি উৎপন্ন করে, অথচ শেষ পর্যন্ত দেখানো হয় যে, মেয়েটি ছেলেটিকে ভালবেসে ফেলেছে। বাস্তব সত্যটা কিন্তু খুবই কঠোর, তা সত্ত্বেও সমাজে চলচ্চিত্রের প্রভাব অপরিসীম বিশেষত যুবসমাজের কাছে। তারাও অনেক সময় তাদের প্রিয় নায়কের আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটি মেয়ের পেছনে লেগে যায়। তারপর কোনো মেয়ে যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করে বা 'না' বলে—তা হলে ওই ধরনের ছেলেদের পৌরুষে নাকি আঘাত লাগে। এরপর ঘটনা অন্য দিকে মোড় নেয়— অ্যাসিড আক্রমণ, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি। চলচ্চিত্রে দেখানো হয় স্টকিংয়ের পরে নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রেম এবং অবশেষে শুভবিবাহে পরিসমাপ্তি ঘটে। বাস্তবজীবন সত্যিই কি এতটা মসৃণ? মেয়েটির ছেলেটিকে পছন্দ নাও হতে পারে— সেক্ষেত্রে? কোনো চলচ্চিত্র কি এর উপযুক্ত সমাধান দিয়েছে? তাছাড়া, আমাদের দেশে স্টকিং যখন আইনত অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত, তখন চলচ্চিত্রে এই প্রবৃত্তিকে কেন গৌরবান্বিত করে দেখানো হয়?

আইনত, স্টকিং এবং মেয়েদের ব্যাপারে অন্যায় কৌতূহল দেখানো বয়রিজম্ জেন্ডার নিউটল— মানে কেবলমাত্র পুরুষরাই বয়রিজম্ এবং স্টকিং করে। সেজন্য দুটি অপরাধের জন্য শাস্তি পাবে শুধুমাত্র পুরুষেরা। স্টকিংয়ের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে সেই পুরুষকে এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত হাজতবাস করতে হবে। মেয়েদের প্রতি আপত্তিজনক কৌতূহল দেখালে প্রথমবার এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত হাজতবাস এবং জরিমানা হতে পারে এবং দ্বিতীয় বা আরও বেশিবার অপরাধ করলে হাজতবাসের মেয়াদ তিন থেকে সাত বছর পর্যন্ত এবং সঙ্গে জরিমানা। পুরুষরা যখন লুকিয়ে মেয়েদের নিজস্ব কাজ দেখে বা ছবি তোলে— তখন তা বয়রিজমের মধ্যে পড়ে। কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ মুম্বাইয়ের একটি কাপড়ের দোকানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন তারা মহিলাদের ট্রায়ালরুমে ক্যামেরা লাগিয়ে গোপনে ছবি নিয়ে থাকে। এই ধরনের ঘটনা বয়রিজময়ের মধ্যে পড়ে।

অনেক সময় মহিলারা স্টকিংয়ে বিরক্ত হলেও থানায় গিয়ে রিপোর্ট লেখাতে চান না। তাঁরা জানলে খুশি হবেন যে, পুলিশ বিভাগ থেকে ২০১১ সালে এ ব্যাপারে সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং অভিযোগকারিণী ৯৪৫৯১০০১০০ নম্বরে ফোনে তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারেন।

বর্তমানে অনেক মহিলা স্কুটি-গাড়ি ইত্যাদি চালান। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে রাত্রে স্কুটিতে যাতায়াত না করাই ভাল। আর গাড়ি চালানোর সময় জানলার কাঁচ বন্ধ এবং দরজা লক করে রাখাই নিরাপদ। এছাড়াও সিট বেল্ট বেঁধে রাখা আরও নিরাপদ। অনেক সময় অপরাধী ধাওয়া করতে করতে গাড়ির দরজাও খুলে ফেলতে পারে, সেক্ষেত্রে বেল্ট বাঁধা থাকলে মহিলাদের অত সহজে গাড়ির বাইরে টেনে বের করা যাবে না। গোলমরিচ গুঁড়োর স্প্রে কর্মরতা বা পথচলিত মেয়েদের কাছে থাকা বাঞ্ছনীয়।

মহিলারা প্রথমাবস্থায় স্টকিংকে অত গুরুত্ব দেন না, অথচ একজন পুলিশ আধিকারিকের মতে স্টকিং একটি গুরুতর অপরাধ এবং মহিলাদের উচিত একে প্রশ্রয় না দেওয়া। মেয়েদের সহজাত ক্ষমতায় তারা সহজেই বুঝতে পারে যে, কে তার পিছু নিয়েছে এবং কে আপন মনে পথ চলছে। সুতরাং তেমন কিছু দেখলে বা বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে থানায় অভিযোগ জানানো উচিত। সেক্ষেত্রে, পুলিশের পক্ষে স্টকারকে সেখানেই হাতে-নাতে ধরা সম্ভব। অন্যথা এর শেষ যে কী হতে পারে তা আমরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না। যখন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তখন আর আমাদের কিছু করার থাকে না।

ন্যাশনাল ক্রাইম রিপোর্ট ব্যুরোর মতে, ভারতে স্টকিংয়ের মতো ঘটনা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। ২০১৪-তে ৪৬৯৯ এবং ২০১৬-তে ৬২৬৬টি স্টকিংয়ের ঘটনা পঞ্জীকৃত হয়েছে। এর মধ্যে খুব কম স্টকার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। সেজন্য, মহিলাদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য স্টকিংয়ের অভিযোগ করতে হবে। স্টকিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং স্টকারদের শাস্তির ঘটনা সমাজের সামনে এলে স্টকারদের উৎপাত কম হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে মহিলাদেরই। ■

ভারতের ইনটেলেকচুয়ালের সংজ্ঞা বদলানো দরকার

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

কয়েক বছর আগে অস্ট্রেলিয়া সংক্রান্ত একটি নিবন্ধ লেখার সময় সেখানকার প্রু গোয়ার্ড নামে এক সাংবাদিক তথা তদানীন্তন শাসক লিবারেল পার্টির সদস্যের একটি পর্যবেক্ষণ আমার নজরে পড়ে যা আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়।

তিনি লিখেছিলেন, ''কনজার্ভেটিভ সরকারগুলির ক্ষেত্রে সেদেশের বুদ্ধিজীবী, বিদ্বজ্জন বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষদের সমর্থন তাঁরা কখনই পায়নি। অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে তো রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবীদের গোষ্ঠীটি নিতান্তই ছোট। তাই রাজনীতিবিদরা এক ধরনের নিঃসঙ্গতায় ভোগেন আর প্রায়শই তাদের নানান বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়।''

গোয়ার্ডের বিশ্লেষণটি অস্ট্রেলিয়া-কেন্দ্রিক হলেও আজকের বিশ্বের গণতান্ত্রিক পরিসরের ক্ষেত্রে তা মোটেই অপ্রযোজ্য নয়। ব্রিটেনের কথা ধরলে দেখা যায় সেখানকার কনজার্ভেটিভ দল যখন শাসন পরিচালনায় ছিল তাদের বলা হতো 'stupid party', এমনকী কখনও কখনও 'nasty party' বলতেও অনেকে ছাড়তেন না। এই মানসিক নীচতা থেকেই এক সময়ের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত মাতব্বররা সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করেননি। একটা সময় কনজার্ভেটিভ দলের আর এক প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুনকে বিদ্রূপ করে বামপন্থী কার্টুনিস্টরা তাঁকে বণিক শ্রেণীর মতলবি প্রতিনিধি হিসেবে প্রদর্শন করে থাকেন।

একই কথা খাটে মার্কিন রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্টদের ক্ষেত্রেও। রোনাল্ড রেগ্যানের রাষ্ট্রপতিত্বে আমেরিকায় কেবলমাত্র ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের পরে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও যেহেতু অতীতে তিনি সিনেমার নায়ক ছিলেন তাই পরিবর্তনগুলিকে রাষ্ট্র-পরিচালনার প্রাজ্ঞতা হিসেবে না দেখে বরাবর তাচ্ছিল্য করে 'সিনেমার নায়ক জন ওয়েলসের সিরিজ' অনুপ্রাণিত বলে খাটো করা হতো। এই অবমাননাকর কার্টুন জর্জ বুশের সময়ও বাদ যায়নি।

ভারতেও জওহরলাল নেহরু তাঁর নিজের এক আলোকপ্রাপ্ত, উদারবাদী, শহুরে সমাজতান্ত্রিক ভাবমূর্তি গড়ে তুলে তাঁর রক্ষণশীল বিরোধীদের এক ধরনের গেঁয়ো, প্রাদেশিক নীচতায় আবদ্ধ থাকা, বহুকাল আগে অচল হয়ে যাওয়া আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বা গো-সংরক্ষণ প্রথার সমর্থক এবং অপরিণত মস্তিষ্কের প্রজাতি বলেই চিহ্নিত করতে সফল হয়েছিলেন। এর সঙ্গে তথাকথিত প্রগতিবাদীদের দৃষ্টিতে সোনায় সোহাগার মতো যোগ হয়েছিল রক্ষণশীলদের ধুতিপরা চেহারা। তাঁরা ধুতিওলা বানিয়া' বা সদা ধান্দা করতে ব্যস্ত 'হিন্দু রাইটিস্ট' বলে একটা ব্যাখ্যা বাজারে চাউর হয়ে গিয়েছিল। এই পৃষ্ঠভূমি থেকেই কেমব্রিজে শিক্ষিত তদানীন্তন রাজ্যসভার কংগ্রেস সদস্য মণিশঙ্কর আইয়ার প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে 'চা-ওয়ালা' সম্বোধন করার মতো ঘৃণ্য ঔদ্ধত্য দেখানোর স্পর্ধা করেছিলেন। সাধারণ ভারতীয়ের প্রতি এই অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই নেহরুভিয়ান সংস্কৃতির প্রতিফলন। এই কদর্য উক্তিটিকে তখন তাঁরা কমনসেন্স বা বাস্তবসম্মত বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। ছদ্মবেশী উদারবাদী হিসেবে নিজের হতাশা ও এক অর্থে তীব্র ঘৃণার উৎসার হিসেবেই প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে 'নীচ' শব্দটির সাম্প্রতিক প্রয়োগ তিনি আবারও করলেন। ধরে নেওয়া যায় এই উন্নাসিক ও সাধারণ নাগরিকের ওপর তীব্র অশ্রদ্ধাই তাঁর যত্নে লালিত উত্তরাধিকার। বাস্তবে ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অনেক

> “পরিকল্পনামাফিক শৃঙ্খলাবদ্ধ সাংস্কৃতিক জ্ঞানের ধ্বংসকর্ম কেবলমাত্র ইংরেজ আমলে সংঘটিত হয়নি। বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা প্রবর্তনের ছলনায় স্বাধীন ভারতেও এই পরিকল্পিত দেশীয় জ্ঞানের অবলুপ্তিকরণের ধারা অব্যাহত ছিল।”

মহান। সম্ভ্রান্ততান্ত্রিক সমাজবাদের দাপট অনেকদিন আগেই স্তিমিত হয়ে এলেও কিন্তু তখনকার আদর্শের পাখিপড়ানো বুলি 'ওরা আলাদা' (The other) অর্থাৎ যারা নির্বোধ, সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ আর নান্দনিকতাবোধে শূন্য পাওয়া মানুষজন এই তফাতবোধটি এখনও ক্রিয়াশীল। সত্যিকথা বলতে, এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই উন্নাসিকতাবোধ একটি সাংস্কৃতিক যুদ্ধের আকার নিয়ে বিপুল বিক্রমে ফিরে এসেছে।

কয়েক বছরের সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়গুলির ওপর নজর দিলেই দেখা যাবে তথাকথিত 'হিন্দু রাইট'দের ওপর বিষোদ্‌গার চলেছে। এই দক্ষিণপন্থীরা মূল হিন্দুধর্মের কোনো অর্থই বোঝে না। ইতিহাসের বিচিত্র গতি-প্রগতির জটিলতা তাদের বোধের অগম্য। দেশের বিচিত্র পোশাক আশাক খাদ্যাভ্যাস যা নিয়ে নাকি 'আইডিয়া অব্ ইন্ডিয়া'-র সৃষ্টি তার নাগাল পাওয়ার মতো জ্ঞান এদের নেই। এগুলিই জ্ঞানীবচন। এনডিএ সরকার আসার পর জেএনইউ-এর এক প্রাজ্ঞ তথাকথিত echochamber (একজন যা পর্যবেক্ষণ করবে সবাই তাই বলবে) এর গবেষক লিখলেন, 'এই হিন্দুসভাবাহিনী একজনও পেশাগত ইতিহাসবিদ এখনও পর্যন্ত তৈরি করতে পারেনি। বিশ্বে যে নানান পরিবর্তন ঘটে গেছে সেগুলি এই হিন্দুমনস্ক ইতিহাসবিদদের আদৌ স্পর্শ করতে পারেনি। এক কথায় বললে ভারতের দক্ষিণপন্থী ইতিহাসবিদদের ইতিহাস জ্ঞানে গভীর ঘাটতি আছে, তাই তাদের ধ্যান ধারণাকে আদৌ কোনো 'পেশাদার ইতিহাসবিদের' অভিমত বলে মান্যতা দেওয়ার কোনো কারণ নেই।

বাস্তবে ভারতের দক্ষিণপন্থী শক্তি বরাবর তার রাজনৈতিক জমি তৈরির ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ দেখিয়েছে তার বিন্দুমাত্রও তারা চলতি ধারার বিকল্প হিসেবে একটি বৌদ্ধিক সংস্কৃতি তৈরির বিষয়ে দেখায়নি। তাদের এই উদাসীনতার ফল আজ দেখা যাচ্ছে। তবে এই ব্যর্থতার আরও একটি গূঢ় কারণ আছে। ১৯৬০-এর দশক থেকে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চিন্তাসূত্রে যদি কোনো মত তথাকথিত উদারবাদী ও মার্কসবাদী চিন্তাধারার পরিপন্থী হতো সেক্ষেত্রে সেগুলি প্রকাশ করা বা চর্চিত হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। সেগুলির অঙ্কুরেই তীব্র বিরোধিতা করা হতো।

একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যেই চর্চার পরিধি সীমাবদ্ধ থাকত। সেই মতের সঙ্গে খাপ না খেলেই তাঁর বা তাঁদের পক্ষে কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়ত। উদাহরণ হিসেবে অতীতে নীরদ সি চৌধুরী বা কিছুকাল আগের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জগদীশ ভগবতীর নাম করা যায়। এই শ্বাসরুদ্ধকর একমতাবলম্বী প্রতিস্পর্ধী পরিবেশে তাঁদের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ানোয় তাঁরা তথাকথিত উদারবাদের অভিঘাতে বৌদ্ধিক উদ্বাস্তু (intellectual refugee) হয়ে পড়েন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি প্রভৃতির ধ্রুপদী বিষয় সংক্রান্ত বিভাগগুলির চর্চা, বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে পড়াশোনা এতটাই অবহেলিত হয় যে সংস্কৃতের মতো বিষয় আজ ভারতে প্রায় পরিত্যক্ত। এটি টিকে আছে পশ্চিমের দেশগুলিতে এনিয়ে উৎসাহের দৌলতে। এরই ফলশ্রুতিতে ভারতের ট্র্যাডিশনাল ইন্টেলেকচুয়ালরা (চিরাচরিত সংস্কৃতিচর্চার বুদ্ধিজীবীরা) মূল ধারার বৌদ্ধিক চর্চায় প্রায় ব্রাত্য হয়ে পড়েন।

মনে রাখা দরকার, এই পরিকল্পনামাফিক শৃঙ্খলাবদ্ধ সাংস্কৃতিক জ্ঞানের ধ্বংসকর্ম কেবলমাত্র ইংরেজ আমলে সংঘটিত হয়নি। বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা প্রবর্তনের ছলনায় স্বাধীন ভারতেও এই পরিকল্পিত দেশীয় জ্ঞানের অবলুপ্তিকরণের ধারা অব্যাহত ছিল।

এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও ভারতের দক্ষিণপন্থী শক্তি একটি সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা ও দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে বড় ধরনের (যে সংস্কার আনছে ও আনতে বদ্ধপরিকর) সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েই কয়েক দশকে বিপুল আকারে বেড়ে উঠেছে। এই বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতের নাগরিকরা বিকল্পের সুযোগ পেলে যে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে প্রথিত চিন্তাভাবনা বা সেই ভারতীয় ভাবধারা ও মূল্যবোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেমন ভারতীয় পারিবারিক জীবন, যৌথ ইতিহাস চেতনা বা চিরকালীন সাধারণ সৌজন্যতাবোধে আস্থা রাখে এমন দলকেই রাষ্ট্র পরিচালনায় বেছে নেবেন সেটি মোটেই আশ্চর্যের নয়।

দীর্ঘদিন ধরে ভারতের দক্ষিণপন্থী শক্তি অবিরল বিদ্রূপ ও কুকথা ধৈর্য ধরে হজম করেছে। এবার কিন্তু সময় এসেছে এই 'মুর্খামির' সংজ্ঞাটিকেই আগাপাশতলা উল্টো করে দেখানোর। ▮

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

শিশুর কথা শেখা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে নবজাতকটি কান্না শুরু করে। কঠিন বাস্তব পৃথিবীতে তার আগমন হয় কান্না দিয়ে। এক মাস বয়স হলে শিশুটি অল্প অল্প ধ্বনি বা শব্দ আওড়ায়। ধ্বনিটি আসে গলার ভেতর থেকে। এ ধরনের শব্দকে বলা হয় 'ওট্রাল সাউন্ড'।

৫ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে শিশুটি নিজস্ব কণ্ঠস্বর ব্যবহার করতে পারে। পাখির কূজনের মতো মধুর স্বরে কিছু বলতে চায়। গলার ভেতর থেকে গলগল করে শব্দ ব্যবহার করে অপরের কথায় সাড়া দেয়।

তিনমাস থেকে শিশুরা আরও বেশি শব্দ আওড়াতে পারে। কারণ এই বয়স থেকে সে ঠোঁট , জিহ্বা এবং স্বরযন্ত্রের পেশির নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই গলার ভেতর থেকে অনবরত গলগল শব্দ বের করতে কোনও অসুবিধা হয় না। নিজের সঙ্গে নিজেই কলকল শব্দ করে খেলতে থাকে। কলকল শব্দ করেই অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য তারা অধীর থাকে। সাড়া পেলে আনন্দিত হয়। বাকশক্তির বিকাশের পথ ত্বরান্বিত হয়। অন্যের সঙ্গে এভাবেই শিশুর নৈকট্য আলাপচারিতা গড়ে ওঠে।

৬ মাস নানা ধরনের শব্দ উচ্চারণ করতে পারে যেমন মা, কাকা ও দাদা। এ ধরনের ধ্বনি ব্যবহার করায় প্রচুর সময় নেয়। এই বয়সেই শিশুটি খেলার সময় মুখ টিপে হাসতে পারে, ভয়ে আর্ত চিৎকার করে উঠতে পারে, অথবা রাগের কারণে চেঁচাতে পারে।

৭ মাস বয়সে মাম-মাম, দাদ-দাদ, বাব-বাব দ্বিত্ব স্বরে একই ধ্বনি বার বার উচ্চারণ করতে পারে। বড়দের মুখের কথাও অনুসরণ করতে পারে।

এক বছর বয়সে শব্দের অর্থপূর্ণ ব্যবহার বুঝতে পারে। সাধারণ দুই তিনটি শব্দ অর্থসহ বলতে পারে। যেমন, মা। আবার অর্থ বোঝার সঙ্গে তারা সাধারণ নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করে। মা'র কাছে যায়। বয়সের পরবর্তী ধাপে শিশুটি প্রচুর শব্দ শিখতে থাকে। শব্দ ব্যবহার করে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলতে থাকে। এ অবস্থায় শিশুটির নিজস্ব ভাষাশৈলী গড়ে ওঠে যার অর্থ কেবল মা-বাবা বা নিকট আত্মীয়তা বুঝতে পারে।

১৮ মাস বয়সে ৬ থেকে ২০টি শব্দ বলতে পারে।

২ বছরে পঞ্চাশের অধিক শব্দ ব্যবহার করতে পারে।

আড়াই বছরে আমি, তুমি, আমাকে, তোমাকে ইত্যাদি সর্বনাম ব্যবহার করতে পারে। হড়বড় করে কেবল প্রশ্ন করা শুরু করে।

তিন বছরে সাধারণ কথাবার্তা চালাতে পারে। অবিরাম কথা বলতে চায়।

চার বছরে ভাষা ব্যবহার ব্যাকরণের নিয়মনীতি শিখে ফেলে শিশুটির বক্তব্য হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ। সহজেই বক্তব্য বোঝা যায়।

তোতলানো—দু' থেকে চার বছর বয়সের সময়ে এই প্রক্রিয়াটি শুরু হতে পারে। যদিও এক সময়ে শিশুরা অনর্গল শব্দ করতে পারে। মাঝে মাঝে শব্দ বা শব্দের অংশ বিশেষ ছাড় দিয়ে বার বার উচ্চারণ করতে পারে। যেন সময়ের ফাঁকটুকু নিজেদের চিন্তাগুলো খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছে। একদিকে কথা বলার খুব ঝোঁক। অন্যদিকে শব্দ তৈরিতে অদক্ষতা ভেতরের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। দ্রুততার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটির পিঠে আরেকটি শব্দ জড়িয়ে দেয়। এটি আসল তোতলামো নয়। বরং একটি অস্থায়ী সমস্যা যা ক্রমান্বয়ে দূর হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাহায্য নিলে বিশেষ উপকার হয়। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে তোতলানোর আশঙ্কা বেশি। আবেগ প্রকাশে যদি প্রতিনিয়ত বাধা পেতে থাকে তবে তোতলামো স্থায়ী হয়ে যেতে থাকে। এক্ষেত্রেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষ কার্যকরী হতে পারে। অন্যদিকে প্রবৃত্তিগতভাবেই শিশুরা নতুন নতুন ধ্বনি আওড়িয়ে আনন্দ পায়। অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। মনে প্রাণে চায় বড়রাও তার আনন্দের শরিক হোক। কিন্তু বয়স্করা তাতে অংশ না নিলে নতুন ধ্বনি সৃষ্টিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

বধিরতা—জন্মগতভাবে বধির হলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে কোনো সুবিধা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু কানের প্রদাহ বা আঘাতজনিত কারণেও অনেকে স্থায়ীভাবে বধির হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থেকেও অনেক শিশু অস্থায়ী বধিরতার শিকার হয়। সেক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রসু হতে পারে। তবে কখনোই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

ফোন নং : ৯৮৩০০২৩৪৮৭

একান্নটি সন্তানের গর্বিত জনক-জননী

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শরীর সকলেরই থাকে কিন্তু হৃদয় থাকে কিছু মানুষের। আবার হৃদয় এমন একটি জিনিস যা শুধু থাকলেই হয় না। তার প্রকাশ দরকার। কিন্তু মুশকিল হলো, হৃদয় নামক জিনিসটি সংসারের ছোটবড়ো নানা স্বার্থের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

ভাগ্য ভালো উত্তরপ্রদেশের এক দম্পতির ক্ষেত্রে তা হয়নি। অনেক চেষ্টার পরেও তারা ছিলেন নিঃসন্তান। এরকম হলে বেশিরভাগ দম্পতিই কমবেশি হীনমন্যতায় ভোগেন। কিন্তু তাঁরা হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। প্রবীণরা বলেন, যে কোনও পরিবর্তনের গোড়াপত্তন হয় মানুষের মনে। এদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। যখন তাঁরা বুঝলেন জন্ম দিতে পারবেন না,

বীরেন্দর এবং মীরা রানার পালিত সন্তানেরা।

জীবন দেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। সেটা ১৯৯০ সাল। সে বছরই তারা প্রথম একটি অনাথ এবং প্রতিবন্ধী শিশুকে দত্তক নেন। এখন, এই ২০১৭ সালে, তাঁরা একান্নটি সন্তানের গর্বিত জনক-জননী। উত্তর প্রদেশের শুকুরতালে তাঁরা গড়ে তুলেছেন একটি অনাথ আশ্রম। আশ্রম-চত্বরে রয়েছে একটি স্কুলও। এখন আশ্রমের বাসিন্দা ছেচল্লিশজন। বাকিরা পড়াশোনা সাঙ্গ করে হয় চাকরির জন্য নয়তো বিয়ের পর আশ্রম থেকে চলে গেছে।

অদ্ভুত এই দম্পতি। শামলির কুড়ানা গ্রামের মীরার সঙ্গে বাগপত নিবাসী বীরেন্দর রানার বিয়ে হয়েছিল ১৯৮১ সালে। বিয়ের প্রায় সাত বছর পর জানা গেল জরায়ুতে টিউমার থাকার কারণে মীরা কোনওদিন মা হতে পারবেন না। গোড়ার একরকম তাঁরা ভেঙেই পড়েছিলেন। সেটা স্বাভাবিকও। আজও আমাদের দেশে সন্তানহীনতাকে জীবনের অসম্পূর্ণতা বলে মানা হয়। পুরুষ হয়তো তার শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে মেনে নিতে পারে। কিন্তু মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পারে না। জীবনের এই অসম্পূর্ণতা মেয়েদের কুরে কুরে খায়। মীরারও তাই হয়ে থাকবে। কিন্তু বীরেন্দর তাকে তলিয়ে যেতে দেননি। ১৯৯০ সালে তাঁরা বাগপত থেকে শুকুরতালে চলে আসেন। সেখানে একটা ছোট জমি কেনেন এবং সে বছরই একটি এক বছরের অনাথ শিশুকে দত্তক নেন। কারণ মীরার অন্তরের শূন্যতা পূরণ করার জন্য এটাই ছিল তখন একমাত্র উপায়। যাই হোক, ছেলের নাম রাখা হলো মঞ্জিরাম। যদিও সেবার বাবা-মা হবার অভিজ্ঞতা তেমন সুখের হয়নি। পাঁচ বছর পর মঞ্জিরাম মারা গেল। কিন্তু তাতে মীরা এবং বীরেন্দরের বাৎসল্যের উৎসমুখ বন্ধ হলো না। বরং নানা ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করল।

আজ মীরা পরিপূর্ণ। নারীত্ব বা মাতৃত্ব— কোনওদিকেই তাঁর কোনও অভাববোধ নেই। তিনি বলেন, 'একটি শিশু হিন্দু না মুসলমান, আমি দেখি না। আমার শুধু মনে হয় ওরা আমার সন্তান। আমাদের একটাই লক্ষ্য, ওরা যেন লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারে।' যে ছেচল্লিশজন এখন আশ্রমে থাকে তাদের মধ্যে উনিশজন মেয়ে, সাতাশজন ছেলে। বেশিরভাগই শারীরিক প্রতিবন্ধী। তাদের থাকার জন্য আশ্রমে রয়েছে অনেকগুলো ঘর, একটি অত্যাধুনিক রান্নাঘর এবং একটা বিশাল খেলার মাঠ। সেই মাঠে খুদেরা যখন বল নিয়ে দাপাদাপি করে মীরা বারান্দায় বসে দূর থেকে দেখেন। খুশিতে চকচক করে ওঠে তার চোখ। তাঁরা নিজেদের জীবনের সঙ্গে আরও অনেকগুলি জীবনকে জুড়তে পেরেছেন। জীবনে এর থেকে বড়ো পাওয়া আর কীই বা হতে পারে। বীরেন্দ্রর বলেন, 'শুকুরতাল গ্রামপঞ্চায়েত আমাদের জমি দিয়েছে। সেই জমিতেই তৈরি হয়েছে আশ্রম। অনেক মানুষ আছেন যাঁরা আশ্রমের খরচ চালানোর জন্য চাঁদা-অনুদান দেন। পাড়া- প্রতিবেশীরাও চাল-আটা-ময়দা দিয়ে সাহায্য করেন। এছাড়া উপার্জনের আর কোনও পথ আমাদের নেই।'

সারাদিন শিশুদের হাসি আর খেলায় ভরে থাকে আশ্রম-চত্বর। পরম যত্নে আর মমতায় ওরা বড়ো হয়। তারপর কেউ চাকরি পায়, কেউ বিয়ে করে। কেউ কেউ আবার স্বেচ্ছাসেবা দেবার জন্য ফিরেও আসেন। যেমন মমতা। তিনি বীরেন্দর এবং মীরার স্নেহচ্ছায়ায় বড়ো হয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি জানি না, ওরা আশ্রয় না দিলে আমার ভবিষ্যৎ ঠিক কেমন হতো! আমি সারাজীবন ওদের কাছে থাকতে চাই। এই আশ্রমের কাজ করতে চাই।' এ বছর মমতা স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। চাইলে চাকরি করতে পারেন। বিয়েও করতে পারেন কাউকে। কিন্তু বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে কিছুই তিনি করবেন না।

বীরেন্দ্রর আর মীরা মেয়েকে বোঝান কিন্তু মেয়ে শোনে না। তৃপ্তিতে আর ভালোলাগায় ভারী আদুরে শোনায় মীরার গলা, 'কী করি বলুন তো এই অবাধ্য মেয়েকে নিয়ে!'

তার জীবনের সব অসম্পূর্ণতা কানায় কানায় ভরে যায়। ■

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর ব্যবস্থা প্রমুখ সীতারাম ডাগার মাতৃদেবী হুলাসীদেবী ডাগা গত ২২ নভেম্বর সল্টলেকের লাবণির বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার চাঁচলের প্রবীণ স্বয়ংসেবক অর্জুনলাল আগরওয়াল গত ২০ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি ২ পুত্র ও পুত্রবধূ, ১ কন্যা, জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ জেলার বৈষ্ণবনগর খণ্ডের বীরনগর শাখার স্বয়ংসেবক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধি পরিমল দাসের পিতা সুধীর দাস গত ১৮ নভেম্বর নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ জেলার কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জ মণ্ডলের পূর্বতন কার্যবাহ হিরন্ময় ত্রিবেদী এবং গোপালগঞ্জ শাখার

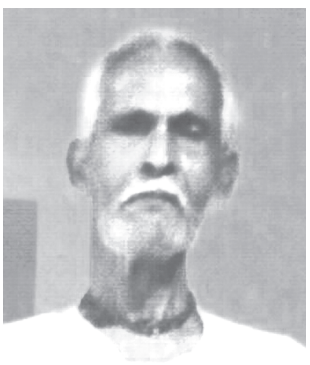

স্বয়ংসেবক অধুনা রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দিরের আচার্য হিমাংশু ত্রিবেদীর পিতৃদেব আশুতোষ ত্রিবেদী গত ২৩ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি গোলাপগঞ্জ এলাকার স্বয়ংসেবকদের অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের প্রাক্তন সেবা প্রমুখ তথা বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহ-সভাপতি জীবনময় বসুর সহধর্মিণী শ্রীমতী জানা বসু দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ৮ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। শ্রীমতী বসু কলকাতা ও মধ্য ভাগের স্বয়ংসেবকদের অতি প্রিয় বৌদি ছিলেন। সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে তাঁর সক্রিয় উপস্থিত অত্যন্ত উৎসাহজনক ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এল সি এল কোম্পানিতে চাকুরি করতেন। স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের দুটি এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর পার্থিব শরীর তাঁর মায়ের দৃষ্টান্ত অনুসারেই কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা গবেষণার স্বার্থে দান করে গেছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

মঙ্গলনিধি

গত ২৩ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট শাখার স্বয়ংসেবক তথা প্রাক্তন প্রচারক জয়দেব মিস্ত্রী ও তাঁর সহধর্মিণী টুম্পা মিস্ত্রী তাঁদের পুত্র সৈকতের মুখে ভাত উপলক্ষে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন খণ্ড ব্যবস্থা প্রমুখ তুষার মণ্ডলের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ২৬ নভেম্বর বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক অবনী নাগের পৌত্র তথা সুকুমার নাগের পুত্র আয়ুষ্মানের শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে অবনী নাগ মঙ্গলনিধি প্রদান করেন দক্ষিণবঙ্গের সহ-প্রান্ত-প্রচারক শ্যামাচরণ রায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্ত, জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ রাজদীপ মিশ্র, জেলাপ্রচারক সৃজন হাজরা-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

* * *

বাঁকুড়ানগরের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নগর কার্যবাহ সন্দীপ মহাপাত্রের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন তাঁর বাবা ও মা জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলা কার্যকারিণীর সদস্য মোহন চট্টোপাধ্যায়-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে আগামী ২৫ ডিসেম্বর এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ১৮ নম্বর নেতাজী সুভাষ রোড সংলগ্ন পরিসরে বিকাল ৪ ঘটিকায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী।

নিঃশুল্ক চক্ষু পরীক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, গরীব ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ ও দরিদ্র মানুষদের কম্বল বিতরণের মতো কার্যক্রমও রয়েছে অনুষ্ঠানে।

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

হরিকিশোর সিংহ
মন্ত্রী

সার্দুলসিং জৈন
অধ্যক্ষ

মনের শান্তি

মিথ্যে কথা বলতে নেই। মা বার বার সোহমকে এই কথা বলে। ছোট্ট সোহম কখনো মিথ্যে কথা বলে না। স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে, খেলার মাঠে কোথাও না। মাকে একদিন সোহম জিজ্ঞেস করলো— 'মা মিথ্যে বললে কী হয়? মা বলল, তুমি যদি মিথ্যে কথা বলো তাহলে পাপ হবে আর ভগবান আমাকে তোমাদের থেকে যার বাড়ি চলে গেল।

দাদার মিথ্যে বলা দেখে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল সোহমের। মা বলেছে মিথ্যে কথা বললে ভগবান মা'কে অনেক দূরে নিয়ে চলে যাবে। তবে দাদা যে এত মিথ্যে কথা বলছে! ভগবান কী তাহলে মাকে অনেক দূরে নিয়ে চলে যাবে!

সোহম দাদাকে বললো, 'তুমি মিথ্যে

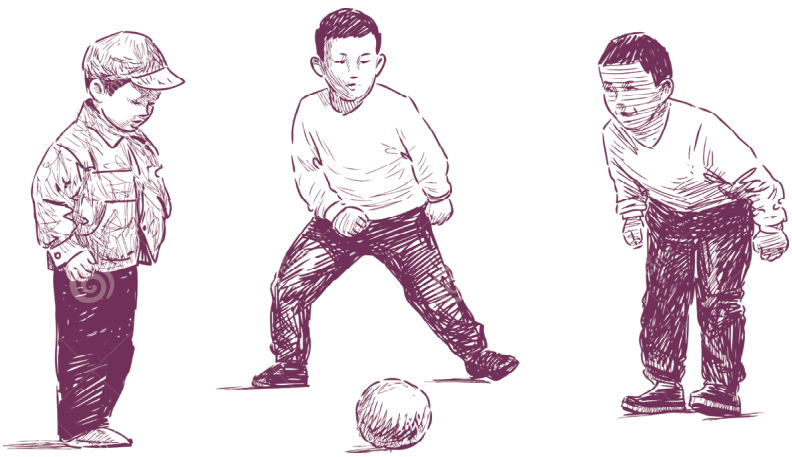

অনেক দূরে নিয়ে চলে যাবে।' শুনে সোহমের ভিতরটা কেমন শুকিয়ে গেল। মা দূরে চলে গেলে সে কোথায় থাকবে? মাকে ছাড়া তো তার ঘুম আসে না। মা খাইয়ে না দিলে তার খাওয়া হবে না। সোহমের কান্না পেল। বলল— না না আমি কখনো মিথ্যে কথা বলবো না।

সোহমের দাদা শোভন ওর থেকে একটু বড়। হস্টেলে থাকে। ছুটিতে বাড়ি এসেছে। দুই ভাই এখন পাড়ায় খেলতে যায়। কিন্তু শোভন সোহমের মতো নয়। শোভন খুব মিথ্যে কথা বলে। সেদিন ক্রিকেট খেলার সময় শোভন আউট হয়ে গেল। অথচ কিছুতেই মানতে চায় না। ক্রমাগত বলতে লাগলো— আমি আউট হইনি, আমি আউট হইনি। শেষ পর্যন্ত আর খেলা হলো না। রাগ করে সবাই যে কথা বলো কেন? খেলায় আউট হলে মেনে না নিয়ে ঝগড়া করো কেন?

শুনে শোভন শুধু দাঁত বের করে হাসলো। সোহমের বুক কেঁপে উঠলো। ভয় পেয়ে গেল সে। এতে নিশ্চয় খুব পাপ হচ্ছে! ভগবান রাগ করছেন।

দু-দিন পরে দাদার স্কুল শুরু হবে। মা ওকে হস্টেলে রেখে আসবে। সকাল সকাল দাদা ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি হয়ে নিল। মা সোহমকে খাইয়ে দিতে দিতে বলল, তুমি বাড়িতে থাকো, আমি দাদাকে হস্টেলে রেখে আসি। সোহম বলল— তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে কিন্তু।

মা হেসে বলল— হ্যাঁ, দাদাকে রেখেই চলে আসবো।

—তুমি পৌঁছে ফোন করবে।

—হ্যাঁ ফোন করবো।

ব্যাগপত্র নিয়ে মা ও দাদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সোহমের মনে খুব দুশ্চিন্তা। দাদা যে এতো মিথ্যে কথা বলে, ভগবান মাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে না তো? মা ফিরে আসবে তো!

মা চলে যাওয়ার পর থেকে সোহম ছটফট করছে। এদিকে বেলা বাড়ছে তবু মায়ের ফোন আসছে না। বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, 'মা ফোন করছে না কেন?'

বাবা বলল, 'হস্টেলে পৌঁছলেই ফোন করবে।'

দুপুর হয়ে গেল তবু মায়ের ফোন এল না। সোহমের খুব কান্না পাচ্ছে। মা কী তাহলে আর আসবে না! ভগবান কী মাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে! কাজের মাসিকে সে জিজ্ঞেস করলো, 'দাদার হস্টেলে পৌঁছোতে কত সময় লাগে? মাসি বলল, 'একবেলাও লাগতে পারে আবার সারাদিনও লাগতে পারে।'

বিকেল হলো। তারপর সন্ধ্যে নামলো। জানালার গ্রিল ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে সোহম। সবাই সন্ধ্যা প্রদীপ দিচ্ছে, শাঁখ বাজছে। মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। ভাবছে মা যদি আর ফিরে না আসে তাহলে কী হবে!

এমন সময় ভেতরের ঘর থেকে বাবার ডাক, 'সোহম মা ফোন করেছে।' সোহমের ভিতরটা যেন আনন্দে নেচে উঠলো। সারাদিনের কত দুশ্চিন্তা, কত আশঙ্কা সব দূরে হয়ে গেল।

সোহম দৌড়ে ভিতরের ঘরে এলো, ফোনটা কানে দিয়েই বলল, 'মা তুমি কখন ফিরছো।'

ওপার থেকে মায়ের গলা, 'এই তো দাদাকে হস্টেলে রেখে বাড়ি ফিরছি। আমি এখন গাড়িতে।'

সোহমের মনে শান্তি ফিরে এলো।

বিরাজ নারায়ণ রায়

ভারতের পথে পথে

হলদিঘাট

ভারত ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ স্থান রাজস্থানের হলদিঘাট। মহারাণা প্রতাপ মাতৃভূমি রক্ষার জন্য মোগলশক্তির বিরুদ্ধে এখানে জীবনপণ লড়াই করেছিলেন। রাজস্থানের উদয়পুর জেলায় এই স্থান। ১৫৭৬ সালের ১৮ জুন রাণাপ্রতাপের নেতৃত্বে রাজপুত সেনার সঙ্গে মানসিংহের নেতৃত্বে মোগল সেনার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় এখানে। ইতিহাসে যা হলদিঘাটের যুদ্ধ নামে খ্যাত। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেও রাণাপ্রতাপকে একসময় যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়তে হয়। উদয়পুর থেকে কিছুদূরেই এই যুদ্ধের সঙ্গেই জড়িত আরও একটি স্থান রয়েছে, সেটি হলো রাণাপ্রতাপের ঘোড়া চৈতকের সমাধি। মহারাণার সঙ্গে তাঁর ঘোড়া চৈতককেও এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। রাজপুতদের কাছে হলিদঘাট হলো বলিদান ভূমি। স্বাভিমান রক্ষায় এই স্থানে বহু রাজপুত বীর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। হলদিঘাট যুদ্ধের বীরগাথা ভারতের ইতিহাসে প্রেরণাদায়ী হয়ে আছে।

জানো কি?

- পশ্চিমবঙ্গে ২৩টি জেলা।
- ভারতে ২৯টি রাজ্য।
- ৭টি কেন্দ্র শাসিত।
- রামনাথ কোবিন্দ ভারতের রাষ্ট্রপতি।
- বেঙ্কাইয়া নাইডু ভারতের উপরাষ্ট্রপতি।
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভালো কথা

ইঁদুরও মানুষের বন্ধু

এতদিন জানতাম ইঁদুর কৃষকের শত্রু। ফসল খেয়ে কৃষকের সর্বনাশ করে। তাছাড়া বড় ইমারত, ব্রিজ নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু সেদিন দাদুর সঙ্গে যেতে যেতে দেখলাম, বিয়ে বাড়ির উচ্ছিষ্ট রাস্তায় ফেলেছে, দুর্গন্ধে নামে রুমাল দিতে হচ্ছে! কাছে গিয়ে দেখি বহু ইঁদুর উচ্ছিষ্ট খাচ্ছে। আমাদের দেখে ইঁদুরগুলি একটুও ভয় করল না। দাদু বললো, ফেরার সময় দেখিব একটুও উচ্ছিষ্ট থাকবে না। ওরা খেয়ে সাফ করে ফেলবে। দাদুই প্রথম বললেন ইঁদুরও আমাদের বন্ধু। জীবজগতের সমস্ত প্রাণীই প্রকৃতির বন্ধু। ওদের মেরে ফেলতে নেই।

প্রিয়ব্রত মণ্ডল, নবম শ্রেণী, চন্দননগর, হুগলী।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

শীতের রোদ

অভীক তরফদার, সপ্তম শ্রেণী, তমলুক

শীতের সকাল সোনা রোদ
ঝলমলিয়ে ওঠে
অল্প অল্প ঠাণ্ডা এখন
মিঠে মিঠে লাগে।
সূর্যদেবের উদয় হতেই
গুটিগুটি পায়ে
ঘরের কাজ ফেলে সবাই
রোদ পোহাতে আসে।
খুব ঠাণ্ডা খেজুর রস
আয়েশ করে খায়
শীতের রোদের সাথে সাথে
দারুণ জমে যায়।
আমরা সবাই মাদুর পেতে
মিষ্টি রোদ মেখে
দুলতে দুলতে পড়া করি
জোরে জোরে হেঁকে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। অভিমন্যু ।। ৪

এই সময় অভিমন্যু ছিল শিশু। কিন্তু মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তার দিকে।

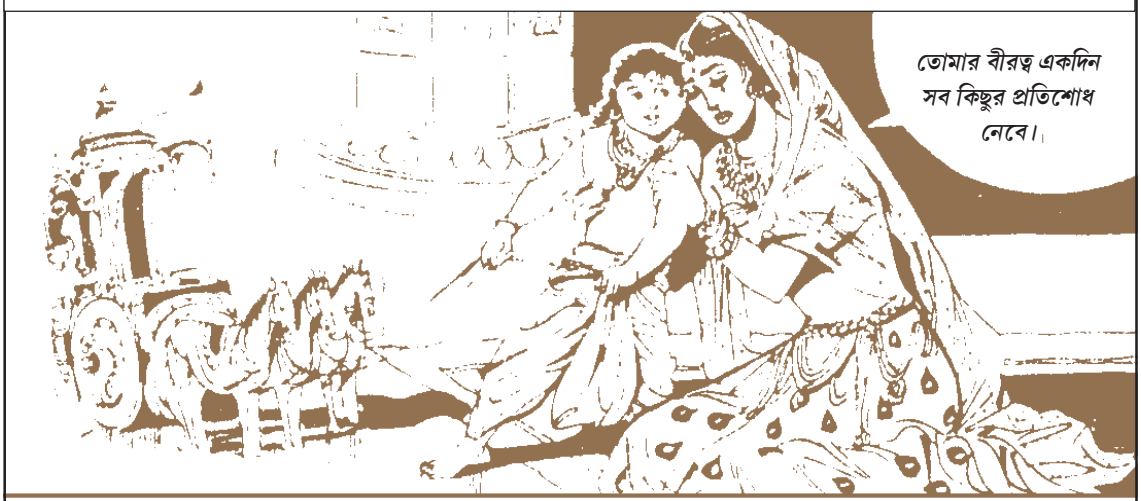

অভিমন্যু ক্রমে যুবক হল। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভাগ্নে।

সবাই তাকে ভালবাসত।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
18 December - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০্ টাকা।।